পল্লিকথা

(ছোট গল্প)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা চারি আনা

উৎসর্গ

—*—
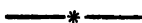
ভগবান যাঁহাকে সকল সুখ-সম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন, বাগ্দেবতা যাঁহার লেখনীকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, যাঁহার অমৃতময়ী রচনাবলী বঙ্গবাসীর প্রাণে আজ নূতন আশার কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, যিনি বঙ্গ-সাহিত্যের মেঘাবৃত নীলাম্বরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, যিনি এতদিন নীরবে বঙ্গবাণীর চরণপঙ্কজধ্যানে নিরত ছিলেন, যিনি মহারাজাধিরাজ হইয়াও দীনদরিদ্রের অতিক্ষুদ্র অভাব, অভিযোগগুলি আলোকচিত্রের মত আপনার উদার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন— যাঁহার নিকট হইতে মানব মনস্তত্ত্বের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শ্রবণ করিতে করিতে, হর্ষে বিস্ময়ে, নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি, সংসারের সামান্য নগণ্য 'খুঁটি নাটি' গুলিও যাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই, যিনি অদম্য অনুকরণের যুগেও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই শাস্ত্রবিদ্, সুপণ্ডিত, মিষ্টভাষী ব্রাহ্মণ, প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর উপযুক্ত বংশধর, মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের, শ্রীকরকমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি-উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম। আশা করি, তিনি মহারাজা হইলেও, ফকিরের সামান্য উপহার সাদরে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

—*—

আশা করিয়া নিরাশ হইলে কষ্টের সীমা থাকে না। "পরিকথা" খুলিয়া যদি কেহ অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যময়ী পরী বা অপ্সরীর অপূর্ব্ব কাহিনী পড়িবার জন্য আগ্রহে আকুল হইয়া থাকেন, তবে গ্রন্থকারের সমূহ বিপদ, কারণ বহুকৃচ্ছ্রসাধন করিয়া যাহাদের দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটে না, তাঁহাদের অবিদিত কাহিনী, লোকসমাজে প্রচার করিবার দুঃসাহস আমার নাই। পাঠকগণ অবশ্য এরূপ নাম নির্ব্বাচনের জন্য একটা কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারেন। কারণ, যাহা দিব বলিয়াছি, তাহা না দিয়া অন্য জিনিস দিয়া প্রতারণা করিবার আয়োজন করিয়াছি, এমন একটা কথা হয় ত তাঁহাদের মনে কখন উঠিতে পারে, সে জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথাটা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখা নিরাপদ মনে করি। ছোট গল্পের নামকরণ করিতে আমি "পরিকথা" নাম পরিগ্রহ করিয়াছি। "পরিকথা" অর্থে আখ্যায়িকা গ্রন্থ—খণ্ডকথা। সুতরাং দীর্ঘ ঈকার সংযুক্ত পরীর এখানে অকস্মাৎ আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেবলোকের সামগ্রী, মর্ত্তবাসী ফকিরের কল্পনায় উদিত হওয়াও 'আকাশ-কুসুম'। ইহাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, ভক্তি প্রীতির কথাই বর্ণিত হইয়াছে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া পদে পদে যে সকল ঘটনার সহিত আমরা নিত্য পরিচিত, তাহারই কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

১লা আশ্বিন সন ১৩২২
মানসী কার্য্যালয়
৪ নং চৌরঙ্গী কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচী।
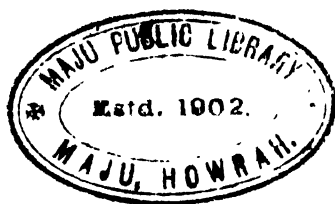
পরিকথা

ঊনআশী নম্বরের বাড়ী

আশী নম্বরের বাড়ীতে তখন আমি থাকি। কোথায়, কোন ষ্ট্রীটে তাহা না বলিলেও গল্পের আর্টের ক্ষতি হইবে না। শ্রাবণ মাস। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই। নিবিড় নীরদে গগন ভরিয়া গিয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটি দলভ্রষ্ট পাখী মেঘের কোলে ভাসিতেছে। একাকী শয়নগৃহে পালঙ্কের উপর বসিয়া অনিমেষনয়নে বৃষ্টিপতন দেখিতেছি। মেঘের উপর মেঘের শ্রেণী ঘনকাজলরেখায় সমস্ত প্রকৃতি নিবিড় করিয়া আনিতেছে। আলো অন্ধকারে মিশিয়া বেশ একটি রং ফলাইয়াছে,—না দিন, না রাত্রি, না সন্ধ্যা, না গোধূলি। যদি কোন বুদ্ধিমান দৈত্য এরূপ বর গ্রহণ করিত, যে আমি দিবসে, রাত্রে বা গোধূলিতে মরিব না, তবে হয় ত এই অভিনব সময়টি তাহার মৃত্যুর পক্ষে দেবতাদের বিশেষ সহায়তা করিত। মাটি ভিজিয়া বেশ একটি সোঁদা গন্ধ বাহির হইয়াছে। কার্ণিশের নীচে কাকগুলি আসিয়া জমিয়াছে। চড়ুই পাখীগুলি একটু বাবুগোছের; তাহারা যেমন চঞ্চল, তেমনই চতুর; সুতরাং ঘরের ভিতর ঢুকিতে একটু মাত্র বিপদ আশঙ্কা করে নাই।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরাজ-সভ্যতা রাস্তাগুলিকে এখনকার সুদৃশ্য ও সভ্য করিতে পারে নাই। পথের উপর রাশি রাশি জঞ্জাল

জমিয়া রহিয়াছে। কোথাও গহ্বরের মধ্যে জল জমিয়াছে—কোথাও বা কতকটা মৃত্তিকা স্খলিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে সেই পথ দিয়া সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছে।

এমন দিনে, যে কেন আমি কবি হই নাই তাহা বলিতে পারি না। যদিও আষাঢ়স্য প্রথম দিবস নয়, তথাপি বর্ষার বর্ষণ আমার মধ্যেও বেশ একটা কাব্যরসের অধীর প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল। আমাদের উঠানে একটি কামিনী ফুলের গাছ ছিল, বৃক্ষটি তখন ফুলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য ফুলের গাছও ছিল, কিন্তু সেগুলিতে তখন কোন ফুল ছিল না।

ভিজা বাতাস ফুলের গন্ধে যেন একটু চঞ্চল হইয়া কখন জোরে, কখন ধীরে ধীরে বহিতেছিল। কত কথাই স্মরণ হইতেছিল—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ?
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

বর্ষার অভিনব ক্ষমতা এই যে, সে সর্ব্বত্র কবিতার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করে। কর্ম্মহীন, বন্ধনবিহীন মধ্যাহ্নে, অনেক অপূর্ব্ব কথা মনে আসিতেছিল। আমাদের পার্শ্বের বাড়ীখানি তখন খালি পড়িয়াছিল। অনেক দিনের পুরাতন অট্টালিকা। বালি চুন খসিয়া গিয়াছে। দুই একটি জানালায় কবাট নাই। সমস্ত দরজা জানলা উন্মুক্ত। কেহ আজ বাতাসে তাহাদের ঘন ঘন উত্থান-পতন নিরোধ করিবার নিমিত্ত একবারও আসিল না। বর্ষায় বাতাস ও জল এক সঙ্গে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। আমার দৃষ্টি সে দিকে পতিত হইলে অনেকক্ষণ একমনে সে দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় সেই বাড়ীখানি যেন বাতাসে আকাশে মিশাইয়া জানি না, কোন ইন্দ্রজালে মানুষের আকার ধারণ করিয়া আমার টেবিলের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল। তারপর সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে বলিল "এই বর্ষার দিনে এই শূন্য অট্টালিকার অবস্থা দেখিয়া অবশ্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করিতেছ তাহা আমি বেশ অনুমান করিতে পারি। আজিকার কষ্ট আমার পক্ষে অতি সামান্য, যদি আমার অতীত কাহিনী একবার শ্রবণ কর তবে বুঝিতে পারিবে আমি কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি।"

বৃষ্টি আর একটু বেগে পড়িতে লাগিল—সমস্ত শব্দ সেই জলের শব্দে মিশিয়া বড় মধুর শুনাইল।

আমি চেয়ারখানি তাহার নিকট সরাইয়া বসিলাম, সে বলিতে আরম্ভ করিল।

"আগে আমার বয়সের কথা বলি। একশত কুড়ি বৎসর মানুষের পরমায়ু; আমার তার অপেক্ষা কুড়ি বৎসর বেশী। ইতিহাসের কথা আর তুলিব না, তবে একটা কথা অবশ্য না বলিলে চলিবে না। তখন এ সহর খুব সামান্য ছিল। বিদেশীরা রাজধানী সন্নিবেশ করিতেছে। বিদেশী বণিকগণ দুই একখানি করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করাইতে সুরু করিয়াছে। এই যে আমাদের সম্মুখের রাস্তাটি দেখিতেছ, ইহা তখন বর্ত্তমানের মতন প্রশস্ত হয় নাই; কেবল মাত্র অল্পপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন রাস্তা লোক-যাতায়াতের সাহায্য করিত। আমার যিনি বর্ত্তমান মালিক তিনি তখন আমার কেহই ছিলেন না। তখন তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার পরিচয় ছিল না। এই বাড়ীর বেশভূষার জন্য তাঁহাকে বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয় নাই। তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন; সপরিবারে কলিকাতায় অবস্থান করিবার নিমিত্ত বাড়ীখানি আদর করিয়া সাধের বাসভবন করেন। তখন আমার ললাটে উন-আশী নম্বর তিলকটীকা অঙ্কিত করা হয় নাই। তখনকার কালে, আমি যে একজন বড়লোক ছিলাম তাহা সে সময় যাঁহারা এ সহর অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। আমার তেমন

স্মৃতিশক্তি নাই যে, সে সময় যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের নাম পাদটীকায় উদ্ধৃত করি।

আজ অট্টালিকাখানি যেমন দেখিতেছ ঠিক উহা এমন ছিল না। উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমাদের এ বাটী তখনও হয় নাই। একটা খালি মাঠ পড়িয়া ছিল, একটা চাঁপাফুলের গাছ ঐ কোনটায় ছিল—অরুণকিরণে, স্নিগ্ধ বাতাসে সে যখন দুলিত, গন্ধে দিক আমোদিত ও মোহিত করিত। এখন গঙ্গা অনেক সরিয়া গিয়াছে বা তাঁহাকে সরাইয়া দিয়াছে। তখন এখান হইতে গঙ্গা দুই বিঘা মাত্র ব্যবধান ছিল। এ জমিটার উপর নৌকা প্রস্তুত হইত। বড় বড় কাঠ চেরাই হইত, অনেক লোক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিত। আমি সেই সকল দেখিতাম,—কত ইংরাজ আসিয়া সেই সকল তরণী কিনিয়া লইয়া যাইত।

বাড়ীখানি তখন নির্ম্মিত হইতেছিল,—তত্ত্বাবধান করিতে তাহার মনিব প্রায় আসিয়া মাঝে মাঝে বকাবকি করিয়া যাইত, এখানটা এমন করিলে কতদিন টিকিবে? পঞ্চাশবৎসর না যাইতে যাইতে, ভাঙ্গিয়া যাইবে প্রভৃতি দোষারোপ করিত। আমি নির্ব্বাক, নিশ্চল ভাবে সকল শুনিতাম, ভাবিতাম গৃহের অধীশ্বর নিশ্চয় তাহাকে অসীম স্নেহ করিতেন, তাই যেমনটি সাজাইলে ভাল হয় সেরূপ করিতে আদেশ দিতেন। অট্টালিকার অঙ্গাভরণ সমস্ত রূপার। চুন সুরকীর রেওয়াজ তখন এমন প্রবল হয় নাই; সুতরাং আগাগোড়া পাকা বা সোণার গহনা হয় নাই। দুই একখানি সোনার আছে, সেগুলি কণ্ঠের ও মস্তকের।

তুমি বোধ হয় এমন সাধের বর্ষায় আমাকে বাতুল ভাবিয়া খুব চটিতেছ? কবে, কোথায়, একটি বাড়ী হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস লইয়া কিনা এমনি সাধের বর্ষায় বকাবকি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সব কাজের একটা অল্পবিস্তর ভূমিকা আছে। আমি পুরাতন ও বৃদ্ধ,

সেই নিমিত্ত আমার কথাগুলা হালফ্যাসনের মত পরিমার্জ্জিত ও সংযত না হইলেও আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা তুমি অনেক দিন শোন নাই। অনেক "নূতন মানুষও" তাহা কোনও দিন শুনাইতে পারিবে বলিয়া ত মনে হয় না।

[২]

ঐ মাঠের উপর যখন এবাড়ী প্রস্তুত হইল—সে ত, সে দিনের কথা—প্রথমে একজন সাহেব এই বাড়ী প্রস্তুত করান। তারপর রংপুরের একজন বড় জমিদার বাড়ীখানি পচ্ছন্দ করিয়া ক্রয় করেন। তাঁহার নাম গঙ্গাগোবিন্দ রায়। প্রথমে তিনি বাড়ীটি ভাড়া দেন, পরে নিজে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পুত্রের নাম তেমন একটা খুব রসাত্মক বা ভাবাত্মক না হইলেও, যে তাঁহার একটি নাম ছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই, আর সে নামটির অন্য কিছু দোষ না থাকিলেও সেটা একটু পুরাতন গোছের—সেকেলে। তাঁহার নাম হরকালী।

হরকালী একটু নব্যতন্ত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যা; তাহাকে সূর্য্যমণি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মেয়েটি যেন প্রফুল্ল-হাস্যের মত শত সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বসিত। নদীর স্রোতের ন্যায় সে খেলায়, হাস্যে, গল্পে সর্ব্বত্র ছুটিয়া চলিত। সে গতিতে বাধা, বিঘ্ন, সঙ্কোচ, বা সে হাস্যে কুটিলতা, কপটতা বা বিদ্রূপ মোটেই ছিল না। সে সর্ব্বত্র আপনার অকলঙ্ক আনন্দ ও সরলতা বিলাইয়া দেবশিশুর দুর্ল্লভ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত। হরকালী তনয়াকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একজন মাষ্টার আসিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। বালিকার সরল শান্ত গতিতে একটা নিয়মের সেতু নির্ম্মিত হইল। সে সহজে যতটা চিন্তা করিতে পারিত, এখন গবেষণা দ্বারা তাহা বুঝিয়া উঠা বালিকার পক্ষে

কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধনমুক্তা হরিণীর মত মাষ্টারের অবর্ত্তমানে সে সমস্ত গৃহখানি আপনার হাস্যে-লাস্যে, গানে-গল্পে, হর্ষে-বিষাদে ভরিয়া তুলিত। উনআশী নম্বরের বাড়ী তখন খালি পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন পূর্ব্বাঞ্চলবাসী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে চিকিৎসা করাইতে ঐ বাটিতে আনিয়া রাখেন। তিনি যে দিনে আসিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করেন, সে দিন তাঁহার মনে কত আশা, কত উল্লাস! কোন্ গৃহখানিতে পুত্রটিকে রাখিবেন, বারম্বার তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। সব ঘরগুলি তাঁহার বেশ মনঃপুত হইল। তিনি আনন্দ-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "দিব্য বাড়ী, সকল ঘরে সমান আলো ও বাতাস।" বাড়ী প্রশংসাবাক্যে গদগদ হইয়া উঠিল। জমিদার অজস্র অর্থব্যয় করিলেন। বাঙ্গালী, সাহেব, নানা ডাক্তার দেখাইয়া কোনও উপকার লাভ হইল না। একদিন অকস্মাৎ শোকাচ্ছ্বাসে বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য অবলোকন করিয়া অমন যে নির্জ্জীব জড় চেতনাবিহীন স্তূপবিশেষ বাড়ী তাহারও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। এই দুঃখ অভিনয়ের কিছু পর পর্য্যন্ত বাড়ীখানিকে সঙ্গীহারা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হয়। অনেকে অখ্যাতি রটাইয়া বাড়ীখানি যে অত্যন্ত অপয়া, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট অলীক কল্পনা বাড়ীর বিরুদ্ধে খাড়া করিতে ক্রুটী করিল না। ইহার কিছু দিন পরে অগ্রহায়ণ মাসে, ফরিদপুর হইতে এক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় জমিদার ঐ বাড়ীতে আসিয়া সপরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিতে আসিয়াছিলেন। খুব ধুমধামের সহিত বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। যে কক্ষে পূর্ব্বে জমিদারপুত্র মারা যান, ঠিক সেই ঘরে বিবাহ-বাসর হইল! যে গৃহ পিতামাতার শোকাবেগে একদিন ভরিয়া গিয়াছিল, আজ হাস্য-কোলাহলে, সঙ্গীত-রসালাপে কৌতুকবাক্যে সেই গৃহখানি উৎসবগৃহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া অতীতের অযত্ন

ও অমর্য্যাদা বিস্মৃত হইল। বাড়ীখানি জমিদারের বেশ মনোমত হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বাড়ীর স্থায়ী মনিব হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাতকুমার দেখিতে বড় সুপুরুষ ও সৌখিন। তিনি দক্ষিণ দিকের কক্ষে থাকিতেন। প্রায়ই গবাক্ষের নিকট বসিয়া পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। ঠিক ঐ জানালার সম্মুখেই এ বাড়ীর এই জানালা। ঐ গবাক্ষের গরদা অবলম্বন করিয়া অনেক সময় সূর্য্যমণি যুবকের মুখের প্রতি অচঞ্চলনয়নে তাকাইয়া থাকিত। সে মুখে সে কি দেখিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না! প্রথম প্রথম উভয়ের ভিতর কোনরূপ বাক্যালাপ হইত না। দুইটি নির্ম্মলহৃদয়ের দৌত্য-কার্য্য চঞ্চল আঁখিই সুসম্পন্ন করিত।

অল্পে অল্পে তাহাদের উভয়ের মধ্যে লজ্জার বাঁধ টুটিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে জড় ইষ্টকপ্রাচীরের দুর্ভেদ্য ব্যবধান বিদ্যমান থাকিলেও অবাধগতি প্রেমের অনাহত স্রোত অবাধেই প্রবাহিত হইল।

সূর্য্যমণি শৈশবে কতদিন এই বাড়ীর মধ্যে নির্ব্বিরোধে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী খেলাঘর গড়িয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, চীৎকার করিয়া প্রতিধ্বনির বিরুদ্ধে ভ্যাংচাইয়াছে, কতদিন কোন্‌টি তাহার ভাঁড়ার ঘর হইবে, কোন্‌টি তাহার শয়নগৃহ হইবে এসব কথা মনে মনে নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু আজ সত্য সত্য শৈশবের সেই সকল অবাধ্য, অসংযত কল্পনাগুলিকে প্রাণপণ যত্নে আপনার করিবার নিমিত্ত জানালায় কয়েদীর মত রেলিং ধরিয়া মুক্তির আশায় ব্যাকুলদৃষ্টিতে প্রভাতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

একটি উৎসবোপলক্ষে প্রভাতের সূর্য্যমণিদের বাড়ী নিমন্ত্রণ হয়। অনেকে নিমন্ত্রণ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যমণি দেখিল প্রভাত আসেন নাই। সে দিন সে অনেকক্ষণ জানালায় যাইতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, প্রভাত তাহাদের জানালার দিকে চাহিয়া

বসিয়া রহিয়াছেন। সে ত্রস্তে বহুদিনের পরিচিত সঙ্গীর মত জিজ্ঞাসা করিল—

"কৈ আপনি এলেন না ?"

"কৈ, তুমি ত আমাকে নিমন্ত্রণ কর নাই ?"

সূর্য্যমণির আনন আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে ইহার পূর্ব্বে আর কোনও দিন এতটা অগ্রবর্ত্তী হইয়া কথা বলিতে সাহস পায় নাই। এ অভিযোগটি তাহার নিকট অত্যন্ত মধুর ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল নিমন্ত্রণে আসিলে হয়ত তিনি কোনও দিন তাহাকে এমনভাবে অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার অবসর পাইতেন না। মৃদু কণ্ঠে সূর্য্যমণি উত্তর করিল "তবে কি আপনি আস্‌বেন না ?"

"নিমন্ত্রণ না করলে যাওয়া বোধ হয় সঙ্গত নয় ?"

"তবে কি আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই বল্‌ছেন ?"

"ভাবিয়া দেখ কখন করেছ ?"

"নিমন্ত্রণ কর্‌বার অধিকার কি আমার ?"

"কৈফিয়ৎ নিবার অধিকার যদি তোমার থাকে তবে কেমন করিয়া বুঝ্‌ব যে নিমন্ত্রণ করার অধিকার তোমার নাই সূর্য্যমণি !"

সূর্য্যমণি—এমন মিষ্ট করিয়া তাহার নাম সে আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শোনে নাই। আনন্দে তাহার প্রাণ গলিয়া গেল। সৌন্দর্য্যের সকল মধুরতা দিয়া বুঝি প্রভাত আজ তাহার কণ্ঠস্বরকে সুমিষ্ট করিয়াছে। প্রভাত যদি সূর্য্যমণির হৃদয় দেখিতে পাইত, তবে হয়ত এ প্রশ্ন করিতে মোটেই তাহার সাহস হইত না; বরং বালিকার নির্ম্মল, অকলঙ্ক শুভ্র হৃদয়-মন্দিরে দেখিত যে তাহারই মূর্ত্তি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"যাই, আপনি আসুন" বলিয়া সূর্য্যমণি ধীরে ধীরে বাতায়নপথ

হইতে অপসারিত হইলে প্রভাত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এক কল্পনাতীত স্বপ্নরাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। ভৃত্য আসিয়া ডাকিল "বাবু। ওবাড়ীর বাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

প্রভাত শশব্যস্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নিমন্ত্রণে যাইল।

[৩]

সে দিন সকাল হইতে সূর্য্যমণিদের বাড়ী আম্রপল্লব ও পতাকাপুষ্পে সজ্জিত করা হইতেছিল। দাসদাসীগুলি লাল রংয়ের ছোবান বস্ত্র পরিধান করিয়া কর্ম্মবাড়ীর বিশেষত্ব ঘোষণায় ব্যস্ত; কেহ কেহ ক্ষুদ্র কাজকে অসম্ভব বড় করিয়া, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শনে অন্যায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। সকলেই সকলকে একই কাজের ভার দিয়া মনিবের নিকট বারংবার তিরস্কৃত হইলেও "এত কাজ যে পারে সে করুক" বলিয়া পথের লোকের কাণ বধির করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছিল না। বৈঠকখানাঘরের পার্শ্বে রোয়াকের উপর বসিয়া 'রুশংচৌকি'ওয়ালারা সানাইয়ে মধুর সঙ্গীতরসালাপ করিতেছিল। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেগুলি উৎসুক দৃষ্টিতে বাজনদারদিগকে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কেহ মাথা নাড়িতেছিল, কেহবা ক্ষুদ্র করে করতালি দিতেছিল। কত দাসদাসী প্রফুল্লমুখে তত্ত্ব লইয়া মন্থরগমনে অন্দরাভিমুখে চলিয়াছে। কে কবে একদিন, কোন্ বড়লোকের বাড়ী তত্ত্ব লইয়া গিয়া, কিরূপ অসম্ভব বিদায় পাইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান বিদায়ের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

প্রভাত নিজহস্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত কুসুম, একখানি সুন্দর বেনারসী সাড়ী, দুইগাছি সুবর্ণনির্ম্মিত রুলি, দুইটি হীরার ইয়ারিং, নানাবিধ

গন্ধদ্রব্যাদি ও মিষ্টান্নাদি মনোমত করিয়া রূপার ট্রের উপর সাজাইল। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল "এগুলি সূর্য্যমণিকে দিয়ে এস।"

আজ সূর্য্যমণির গায়ে হলুদ। প্রভাতকুমার কিছু বিষন্ন। যেন বন্যার বেগে নদীর বাঁধ কোথায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেন আজিকার আনন্দোৎ-সবের স্রোত তাহার অন্তরের বেদনায় অজ্ঞাতে আঘাত করিতেছিল। প্রভাত সূর্য্যমণিদের পাল্টিঘর, সূর্য্যমণির পিতার নিকট প্রভাতের সহিত সূর্য্যমণির বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নদীয়ার বিখ্যাত জমিদারপুত্রকে ত্যাগ করিয়া প্রভাতের সহিত সূর্য্যমণির বিবাহ দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত মনে করিলেন না। যে প্রিয় কন্যার সুখ ও আনন্দের জন্য সূর্য্যমণির পিতা—আজ অজস্র অর্থব্যয় করিতে মুক্তহস্ত, বুঝি-লেন না,—সে কন্যার সুখ কোথায়! আনন্দ কিসে! দূর হইতে স্নেহের বশে অনেক সময় এমন করিয়া প্রিয়জন সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের পসরাই কিনিয়া আনেন। উদ্যানজাত অপরিপূর্ণ ক্ষীণপুষ্পের ম্লান গন্ধে আত্মহারা হইয়া তাহারই যশোগানে দিক মুখরিত করা হয়, আর অযত্নবর্দ্ধিত পরি-পূর্ণকায় সৌরভব্যাকুল অরণ্যজাত কুসুমের অম্লান সৌন্দর্য্য অরণ্যেই মিলাইয়া যায়।

প্রভাত পুস্তক লইয়া প্রতিদিনের মত নির্দ্দিষ্ট জানালার নিকট গিয়া সে দিনও উপবেশন করিল। সে নিজের জন্য যত কষ্ট অনুভব না করিল সূর্য্যমণির মনের অবস্থায় চিন্তা করিতে তাহার নয়নপল্লব অশ্রুসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সে ঘরের জানালায় সূর্য্যমণি ,সে দিন আসিয়া দাঁড়াইল না। গৃহের সম্মুখ দিয়া অন্যান্য রমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যাইবার সময় কি কাতরদৃষ্টিতে সে প্রভাতের জানালার দিকে একবার চাহিল! প্রভাতের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। জানালার লৌহগরাদাগুলি আজ জেলখানার রেলিংয়ের মত নির্ম্মম ও কঠিন হইয়া উঠিল। সূর্য্যমণি যেন

জেলখানার ভিতর হইতে মুক্তির জন্য করুণনয়নে বেদনা জানাইল। প্রভাত আপনাকে সংযত করিতে বৃথা চেষ্টা করিল, শুভদিনে তাহার নয়ন বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

[৪]

তাহার পর তিনবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রভাত তেমনই জানালার ধারে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সূর্য্যমণি শ্বশুরালয় গিয়াছে। তাহাতে তাহার বড় বেশি কিছু আসিয়া যাইত না। সে পূর্ব্বে যেমন চাহিয়া থাকিত এখনও তেমনই থাকে। অনুমাত্র অন্যথা হয় না। তাহার কিছুদিন পরে একদিন সূর্য্যমণি একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রভাত একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। কাঁচের পুতুলের পলকহীন চক্ষুর মত তাহার দৃষ্টি নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সূর্য্যমণি যেন তপস্বীর তীব্র আকর্ষণে স্নেহময়ী দেবীর ন্যায় জানালায় আসিয়া উপস্থিত হইত। তপস্বী কোনও বর প্রার্থনা করিত না—বরদাত্রীও বিষাদজড়িত মুখে, অচঞ্চলচরণে প্রতিদিন আসিয়া এমনই ভাবে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু এ যোগ বেশি দিন চলিল না। একদিন কতকগুলি মিস্ত্রী আসিয়া উভয় গবাক্ষের মধ্যে এক নির্ম্মম প্রাচীর দিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে প্রণয়ী তপস্বীর কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সে মোটেই এ অন্যায় আচরণে আপত্তি করিল না, সে প্রতিদিন যেমন জানালায় আসিত তখনও তেমনই আসিতে লাগিল। সেই অচঞ্চলদৃষ্টি তেমনই অনাহতভাবে সে দিকে তাকাইয়া থাকিত।

এইরূপে আরও একবৎসর অতীত হইল প্রভাতকুমার দার-পরিগ্রহ করিল না। চিরকৌমার্য্য তাহার জীবনের ব্রত এ সমাচার সকলেই জানিতে পারিল। সূর্য্যমণিও দাসীর মুখে এই কথা শুনিল। সে

ছুটিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কেন, সহসা কিজন্য সে এমন ভাবে আসিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। ইষ্টকপ্রাচীর ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি কাতরভাবে যেন প্রভাতের নিকট নত হইয়া পড়িল।

[৫]

সহসা এক দিন বাড়ীতে তালা দিয়া প্রভাত তীর্থপরিভ্রমণে বাহির হইল। দুই বৎসর দেশে ফিরিল না। যখন সে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন তাহার মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকশিত। সে আসিয়া সেই জানালায় গিয়া পূর্ব্বের মত বসিল; তখন প্রাচীরটি অল্প ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার গবাক্ষের সম্মুখের অংশটুকু ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। প্রভাত একটু হাসিল।

সূর্য্যমণি বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে বিষাদছায়া, কেশদাম মুক্ত, সীমন্তে সধবার চিহ্ন বিলুপ্ত, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র; শিশুটি ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া জননীর অঞ্চল অবলম্বন করিয়াছে। প্রভাত তাহাকে দেখিয়া কোন কথা কহিল না--কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এই দুটি দেবদেবী যদিও একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই. তথাপি তাহারা যে পবিত্র প্রণয় শিক্ষা দিয়া গিয়াছে—তাহার কাহিনী বহুদিন যাবৎ বক্ষে ধারণ করিয়া আছি। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত দেখিয়াছি—প্রভাতকুমার সেই একাসনে বসিয়া এই জানালার দিকে তাকাইয়া আছে,---তখন সূর্য্যমণি ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সূর্য্যমণি মারা যাইবার কিছুদিন পরে সহসা প্রভাতকুমারের দৃষ্টি জানালার খড়খড়িতে আবদ্ধ একখানি জীর্ণ মলিন খামের উপর পড়িল, সেখানি খড়খড়ির গায়ে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, বহুকষ্টে প্রভাত তাহা তুলিল। খামের উপরে যে নাম

লেখা ছিল তাহা ধূলা ও জলে আচ্ছন্ন হওয়ায় পড়া যায় না। খামখানি উন্মোচন করিতেই সে দেখিল—লেখা আঁছে—

"তুমি কি "পূর্ব্ব জন্ম" মান ইতি।"

সূর্য্যমণি।

তাহার পর হইতে প্রভাতের কখনও নয়ন বহিয়া অশ্রু বক্ষ প্লাবিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে; কখনও তাহার নীরব হাস্যে নিজেই আত্মহারা হইয়াছে; কখনও সারারাত্রি বাতায়নের দিকে চাহিয়া—কাহার সহিত যেন মৃদুকোমল কণ্ঠে কথোপকথন করিয়াছে; কখনও বা ছিন্ন মলিন পত্রখানি বক্ষে চাপিয়া বলিয়াছে "মানি, সূর্য্যমণি পূর্ব্বজন্ম মানি"।

অচেতন অচল জড় বলিয়া এতদিন এ কাহিনী এই ভগ্নপঞ্জরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি; কিন্তু শুনিলাম আমার বুকের উপর দিয়া একটি নূতন রাস্তা শীঘ্রই বাহির হইবে। নূতন রাস্তায় পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইব। তাই আজ তোমার নিকট আমার 'গুপ্তধন-সম্পত্তি—স্বর্গীয় প্রণয়কাহিনী প্রকাশ করিলাম—এখন পথে পড়িয়া মরিলেও দুঃখ নাই।

চাহিয়া দেখিলাম বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে, আকাশ নির্ম্মল, মেঘহীন। রৌদ্র লাগিয়া—তরুপল্লবে সঞ্চিত জলবিন্দুগুলি হীরার মত ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। মনে হইল বুঝি আজও বাতায়নে প্রভাতকুমার অনিমেষ-নয়নে সূর্য্যমণির জন্য চাহিয়া রহিয়াছে।

জগুয়া

[১]

জগুয়া যে দিন কাঁদিতে কাঁদিতে খগেন্দ্রবাবুর বাসাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, ঠিক তাহার ছয়দিন পূর্ব্বে হতভাগ্যের জননী তাহাকে নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান। খগেন্দ্রবাবু তখন গঞ্জামের অন্তর্গত বার্‌মপুরে কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করেন। জগুয়ার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সহানুভূতি-কাতর কোমল-অন্তর খগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মহামায়া, তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিলেন; কাছে বসাইয়া মাতৃস্নেহে জগুয়ার শোকসন্তপ্তহৃদয় সিক্ত ও আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। তখন জগুয়ার বয়স দশ বার বৎসরের অধিক নয়। সেই অবধি জগুয়া মহামায়ার নিকট রহিয়া গেল। তার প্রায় সকল কথা মহামায়া বুঝিতে পারিতেন না। খগেন্দ্রবাবু এক দিন একখানি তেলুগু প্রথম-ভাগ কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, "এ বইখানি পড়তে শেখ, তাহা হ'লে জগুয়ার কথা সব বুঝতে পারবে।" 'হরপ' দেখিয়াই ত মহামায়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন; বলিলেন "যেমন কথার ছিরি, তেমনই অক্ষরের চেহারা; পোড়া কপাল আর কি? খেয়ে দেয়ে ত আর কাজ নেই এই 'ঘোড়দৌড়ে ভাষা' শিখি।" এ অঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বলে; সেই নিমিত্ত মহামায়া এদের ভাষাকে ঐরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন।

খগেন্দ্রবাবু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এটা তোমার অন্যায়; কোন ধর্ম্মের যেমন নিন্দা করা উচিত নয়, তেমনই কোন ভাষারও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নয়।"

"আমি ত আর পণ্ডিত নই যে, ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কর্‌তে বসেছি, আমার ভাল লাগে না, তাই বল্‌ছি।"

খগেন্দ্রবাবু রসিকতা করিয়া ও মহামায়াকে রাগাইবার জন্য বলিলেন, "আজ বাজারে যে রাশি রাশি "কমলাপাণ্ডু" এসেছিল কি আর বল্‌ব। আমাকে একটু খানি "পালু" দিতে পার? যদি না থাকে তবে না হয় একটুখানি "নীলু"ই দাও।' 'নীলু', 'পালু' শুনিয়া মহামায়া রাগে গরগর করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "এ পাপ কথাগুলি কি না বল্লেই নয়?"

জগুয়ার সব কথা মহামায়া বুঝিতে না পারিলেও বালকের নিষ্কলঙ্ক নয়নের মধ্য দিয়া কৃতজ্ঞতার যে নীরব ভাষা বিকশিত হইত, তাহার প্রতি বর্ণ মহামায়ার সরল অন্তরে প্রতিফলিত হইত।

যখন প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলি গিরিশিরে ছুটাছুটি করিয়া সায়াহ্নে রক্তিমাভ বিশাল জলধিগর্ভে ডুবিয়া যাইত, যখন নির্জ্জনতা সর্ব্বদিক হইতে তাঁহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিত—প্রবাসের অপরিচিত পাখীগুলি দূর দূরান্তরে মেঘের কোলে মিশিয়া অদৃশ্য হইত, তখন মহামায়ার হৃদয় একটা অনন্ত অভাবের পশ্চাতে রোদন করিয়া ফিরিত—এখানকার কোন কিছুর ভিতরে তিনি যেন শান্তি বা তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইতেন না। তখন অবলম্বন-বিহীন অন্তর প্রবলভাবে জগুয়াকে নিকটে টানিয়া লইত। তাহার মধ্যে যেন মহামায়ার সকল অভাব, সকল অতৃপ্তি অদৃশ্য হইত। জগুয়া নিকটে বসিলে মহামায়ার শূন্যদৃষ্টি যেন ফিরিয়া আসিত। মনে হইত যেন এমনই একটা কিছুর অভাব তাহাকে সর্ব্বদিক হইতে পীড়ন করিতেছে।

জগুয়ার সহিত গল্প করিয়া মহামায়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। জগুয়া মহামায়ার কথার অর্থ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিত না। জগুয়া এত স্নেহ ও মমতা কোন দিন পায় নাই, পাইলেও তাহা বুঝিবার মত

শক্তি তখন তাহার ছিল না ; কিন্তু মহামায়ার কথার বিশেষ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইলেও সেই সকল কথা তাহার অন্তরে এমন একটু কোমল মধুর আঘাত করিত, যাহাতে সে আপনাকে মহামায়ার পুত্রের অপেক্ষা কোনও অংশে কম বলিয়া ভাবিবার অবসর পাইত না। সংসারের সকল কাজ ত্যাগ করিয়া সে মহামায়ার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিত। অনেক সময় খগেন্দ্রবাবু ডাকিয়া তাহার সাড়া পাইতেন না ; সুতরাং তিনি অত্যন্ত চটিয়া যাইতেন। খগেন্দ্রবাবুর ক্রোধে জগুয়া বড় ভয় পাইত না। মহামায়া যদি কোন দিন কোন কারণে অধিক কথাবার্ত্তা না বলিতেন, তবে জগুয়া সে দিন সকল দিক্ যেন শূন্য নিরীক্ষণ করিত। তাহার সহিত যে পৃথিবীর একটা গুরুতর সম্বন্ধ ও সংযোগ রহিয়াছে, তাহা সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইত। সে দিন কাহারও সহিত সে কথা বলিত না। গৃহের এক কোণে নীরবে বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিত। মাতৃহারা বালকের অন্তর সেদিন মায়ের জন্য আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিত। সে কত কি ভাবিত ; ভাবিতে ভাবিতে সকল উৎসাহ হারাইয়া কেমন উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত। শত সহস্র ডাকে কেহ তার সাড়া পাইত না। আকাশে মেঘ ভাসিয়া যাইত, সে তাহাই দেখিত। মনে করিত, কোন গতিকে যদি একবার সে মেঘের নাগাল পায়, তবে আর এখানে থাকিবে না, মেঘদের সঙ্গে তার মায়ের কাছে চলিয়া যাইবে। অভিমানভরে এমন অনেক অলীক কল্পনা তার শিশু মস্তকে জমাট বাঁধিতে থাকিত।

মধ্যাহ্নে রৌদ্রদগ্ধ প্রবল বাতাস যখন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া, নির্জ্জনতার মধ্যে চাঞ্চল্যের উদ্রেক করিয়া তুলিত, তখন মহামায়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিতেন। জগুয়াকে দুই একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইলে অধীর

হইয়া পড়িতেন, তাঁহার অবসাদ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত। তারপর যখন দেখিতেন, তাঁহারই গৃহের এক কোণে সে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, তাহার নয়ন কোণে অশ্রু জমিয়াছে, কম্পিত অধরপল্লবে কত করুণ আবেদন সঞ্চিত রহিয়াছে, তখন মহামায়ার স্নেহ-প্রবণ অন্তর বিগলিত হইত—তিনি করুণ করস্পর্শে মৃদুকণ্ঠে ডাকিতেন, "জগুয়া, ওঠ্ ওঠ্, এত অবেলা পর্য্যন্ত কি ঘুমাতে আছে?" জগুয়া সে করস্পর্শে ও আহ্বানে পুলকিত হইয়া উঠিত। তখনই সে পুত্রের মত আব্দার করিয়া ক্ষুধার অভিযোগ উপস্থিত করিত। জগুয়ার এই সব আব্দার মহামায়ার হৃদয়ের অজ্ঞাত অভাবটা অনেক পরিমাণে পূরণ করিতে লাগিল। মহামায়া হাতে এই সব কাজ পাইলে মনে মনে যে বড় খুসী হইতেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার জননীসুলভ আচরণগুলি বড় মধুর ভাবে সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় রীতিমত প্রদীপ পড়িত, ঠাকুর দেবতাগুলি অনেক পূজা ও আদর লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ইদানীং অতিথিও মহামায়ার করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না। মহামায়া শক্ত কথা বড় কাহাকেও বলিতেন না। খগেন্দ্রবাবু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন যে, মহামায়ার প্রকৃতিতে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোথাও একটুখানিও উদ্ধতভাব দৃষ্ট হয় না—হাস্য-পরিহাসচঞ্চলা মহামায়া, দয়াদাক্ষিণ্য-প্রদায়িনী দেবী মহামায়ার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন,—খর-প্রবাহিনী মন্দাকিনী, মন্থরগমনা যমুনাসুন্দরীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের মূলে তিনি দেখিলেন, জগুয়া, এই নিরাশ্রয় তেলুগু বালকটির সুখ-দুঃখের উপর মহামায়ার হর্ষ-বিষাদ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

মহামায়া জগুয়াকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন তিরস্কারও করিতেন। একদিন সে রাগ করিয়া খায় নাই। চাকরের এরূপ অভিমান বা রাগ

করিবার যে কোন অধিকার নাই, জগুয়া সে কথা মোটেই বুঝিত না। মহামায়া খুব গম্ভীর হইয়া তাহাকে তাড়না ও তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "লক্ষীছাড়া, অমন করে উপোস্ কল্লে যে অসুখ কর্‌বে, তখন তোকে দেখ্‌বে কে ?"

জগুয়া উত্তর করিল, "কেন তুমি !"

"আমার ভারি গরজ—তুই হতভাগা ইচ্ছে ক'রে রোগ কর্‌বি, আর আমি তোর সেবা ক'রব,—না ?"

"আমি ত'আর বল্‌চি না—কেউ আমার সেবা করুক্।"

এমনই করিয়া মহামায়ার প্রবাসের দিনগুলি বেশ এক রকম কাটিতে লাগিল। জগুয়া মহামায়ার নারীহৃদয়কে জননীর করুণায় জাগাইয়া তুলিতে কোনদিক হইতে অপূর্ণ রাখিল না। জগুয়া দেখিল, মহামায়া তাহার জননী,—মহামায়া ভাবিল, জগুয়াই তাহার একমাত্র সন্তান। এই মা ও ছেলে সম্বন্ধটি অজ্ঞাতসারে উভয়ের অন্তরে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতেছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

[২]

আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জগুয়া মহামায়ার সমস্ত হৃদয় পুত্রস্নেহে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহামায়া দেশে যাইবার জন্য স্বামীকে অনেকবার পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন; কিন্তু যে দিন হইতে জগুয়া তাঁহাদের সংসারে, পথহারা পথিকের মত আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেইদিন হইতে এই বালক যাদুকরটি মহামায়াকে এমন এক অভিনব মায়ার ফাঁস পরাইয়া দিল যে, তিনি দেশে যাইবার কথা বড় তুলিতেন না। যখন তিনি ভাবিতেন, দেশে যাইতে হইলে এই মাতৃহীন বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন জগুয়ার নিঃসহায় অবস্থা

স্মরণ করিয়া, তাঁহার করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। কোন দিন মহামায়া ভাবিতেন, এই বিদেশী বালকটি কেন এত করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে? কোন কথা না কহিলে সে অমন বিমর্ষ হইয়া পড়ে কেন? আবার মনে হইত—না, তার দোষ কি? তা'কে না দেখিলে আমিও যে থাকিতে পারি না,—তার কি? জগুয়া ছেলেটি বড় ভাল—আহা, ওর মা যদি বেঁচে থাক্‌ত, তা হ'লে কি আর এত কম বয়সে ওকে চাকরী কত্তে দিত।

মহামায়ার নিকট জগুয়া আব্দার ও অভিমান না করিলে যেন তাঁর দিন যাইত না। সে দিন খগেন্দ্রবাবু—হাসিতে হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "তোমার দেখ্‌চি কপাল ভাল—বিনা কষ্টে এত বড় পুত্রলাভ।"

মহামায়া কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। কৃপণকে কেহ তাহার গুপ্ত-অর্থের সন্ধান বলিয়া দিলে বা তাহার উল্লেখ করিলে, সে যেমন চমকিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়ে, সে কথায় মোটেই কাণ দেয় না—অন্য কথার উত্থাপন করে, এ ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইল—মহামায়া বেশ একটুখানি গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

এরূপ অনেক খুঁটিনাটি লইয়া খগেন্দ্রবাবু ও মহামায়ার মধ্যে মাঝে মাঝে অভিমানের অভিনয় চলিতে আরম্ভ হইল। এই সকল ব্যাপারের মলে জগুয়াই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন কি একটা সামান্য বিষয় লইয়া খগেন্দ্রবাবু জগুয়াকে তিরস্কার করিলেন। সে দিন সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। মহামায়া ইহার কিছুই জানিতেন না; সুতরাং জগুয়াকে যখন অনেক বেলা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার অত্যন্ত ভাবনা হইল। তিনি স্বামীকে বলি-লেন, "জগুয়া আসে নাই, কোথায় গেল? একবার ডাক্‌তে পাঠাও।" জগুয়ার প্রতি একটা অনুগ্রহ বা স্নেহ খগেন্দ্রবাবু মোটেই পছন্দ করিতেন

না ; সুতরাং বেশ একটুখানি বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"ভাল পাপ এসে জুটেছে। বেটা চাকরী করতে এসে, ছেলের বাড়া আদুরে হয়ে বসেছে, এতটা আস্কারা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।" কথাগুলির ভিতর মহামায়ার প্রতি যে একটি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত ছিল, তাহা যে মহামায়া না বুঝিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; বরং কাতরকণ্ঠে অত্যন্ত ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি ত জান, বেচারীর কেউ নেই। ছেলেমানুষ, কোথাও হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বেলা দুপুর হয়ে গেল, কখন খাবে ? তোমার পায়ে পড়ি, একজন কাউকে পাঠাও।"

খগেন্দ্রবাবু ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, পেটের জ্বালা এমন নয়—জ্বালা ধরলেই এসে হাজির হবে এখন, বাবুকে আর ডাকতে হবে না।"

এবারও মহামায়া কোন উত্তর দিলেন না। রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

খগেন্দ্রবাবু বিছানায় শুইয়া শুইয়া মহামায়া ও জগুয়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

[৩]

বৈশাখ মাসের শেষ ; অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, নির্মেঘ—জলের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। খগেন্দ্রবাবু কাছারী হইতে একটু সকাল সকাল সেদিন চলিয়া আসিয়াছেন। মহামায়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া তাঁহার জন্য ফল ছাড়াইতেছিলেন। জগুয়া পাখা লইয়া খগেন্দ্রবাবুকে বাতাস করিতেছিল। এমন সময় খগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "জগুয়া, তুই এখান থেকে যা, আর বাতাস করতে হবে না!" সে মহামায়ার দিকে চাহিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

খগেন্দ্রবাবু জলযোগের পর তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "আস্‌ছে মাসে একবার দেশে যাব মনে করেছি। ঐ সময় পথে তোমাকে পুরী দেখিয়ে নিয়ে যাব, কেমন?"

মহামায়া এমন একটা প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি সহসা বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এই সময় জগুয়ার কথাই তাঁহার মনে বেশী করিয়া উদয় হইল; সুতরাং তিনি স্বামীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নখ দিয়া নখ খুঁঠিতে খুঁটিতে অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "এখন কি যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন? সুমুখে বর্ষাকাল, দেশে ম্যালেরিয়া—"

"না, আস্‌চে মাসেই যেতে হবে।"

"তা হ'লে জগুয়া কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

খগেন্দ্রবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিলেন। পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "ওকি বাঙ্গলা দেশের পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? আর তা'র কাকাই বা পাঠাবে কেন?"—বলিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন।

মহামায়ার মনে এক সঙ্গে অনেকগুলি চিন্তা জাগিয়া উঠিল। আর একবার ধীরস্বরে বলিলেন, "দিন কত পরে গেলে হ'ত না?"

খগেন্দ্রবাবু মহামায়ার অবস্থা দেখিয়া বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "না।" মহামায়া আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর সেদিকে আসিলেন না। জগুয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইল।

[৪]

বৈকাল বেলা, আকাশে একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল।

মহামায়ার মনটা বড় ভাল ছিল না। ঘরের কোণে একটা বিড়াল শিকারের চেষ্টায় ওত পাতিয়া বসিয়াছিল। খাঁচার মধ্যে ময়না এক একবার এদিক ওদিক করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে শান্ত হইয়া বসিতেছিল। আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, "জগুয়া, জ—গু—য়া।" মাহামায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাজ খুঁজিতেছিলেন। অন্য কোন কাজ না পাইয়া, তোরঙ্গ খুলিয়া জগুয়ার জন্য কাপড় জামা বাছিয়া বাছিয়া গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। বড় হইয়া সেগুলি সে পরিবে। ভাল ভাল খেলনাগুলি সব একত্র করিলেন।

সবুজ রঙ্গের গায়ের কাপড় জগুয়া বড় পছন্দ করিত; তাই তিনি দশটি টাকা পৃথক্ করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। তাহাকে আরও কি কি দিয়া যাইবেন, এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

মহামায়া সেদিন জগুয়ার জন্য বিশেষ করিয়া মাছের অম্বল রাঁধিলেন। জগুয়া তাঁহার হাতের রান্না অম্বল খাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। অম্বল হইলে, তাহার আর কোন তরকারীর বড় প্রয়োজন হইত না; কিন্তু এত করিয়াও মহামায়া মনকে বুঝাইতে পারিলেন না। জগুয়াকে ছাড়িয়া তাঁহার দেশে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, জগুয়া কি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে? কেন পারিবে না, সে ত আমার কেউ নয়! তাই কি? তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না কেন? না, না, আমি কিছুতেই পারিব না, বেচারী যদি কাঁদিয়া বলে, 'মা, আমি কোথা থাক্‌ব?' মহামায়া আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

এমন সময় জগুয়া আসিয়া দেখিল, মহামায়া আজ অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি তাহার দিকে তেমন স্নেহনেত্রে অন্যান্য দিনের মত ফিরিয়া

তাকাইলেন না। এ পরিবর্ত্তন জগুয়ার দৃষ্টি এড়াইল না। সে মনে করিল, নিশ্চয় কি একটা বিভ্রাট্ ঘটিয়াছে। মহামায়ার মুখের ভাব দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না। ময়নাটা তাহাকে ভ্যাংচাইয়া ডাকিল 'জ—গুয়া'।

জগুয়া জানিত এ ক্ষেত্রে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহামায়া উত্তর দিবেন না; সুতরাং সে বলিল "মা, বড় খিদে পেয়েছে?"

মহামায়া তাড়াতাড়ি খাবার দিলেন। অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন, "হ্যাঁ রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? কাল বাবুর সঙ্গে দোকানে গিয়ে একখানা সবুজ রঙ্গের গায়ের কাপড় কিনে আনিস্।"

"কেন মা কি হবে?"

"তোকে দিয়ে যাব। দেখ্, আমায় চিঠি দিস্। যখন যা দরকার হবে, তখনি লিখে পাঠাস্—জান্লি?" তারপর মহামায়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বিচারকের ফাঁসির আদেশ দেওয়া অপেক্ষা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিল—নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ময়না চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও ময়না পড় দেখি"

কেহ তখন তাহার কথায় সাড়া দিল না দেখিয়া, সে অভিমান-ভরে খাঁচার এক পার্শ্বে বসিয়া বাটী হইতে ঘরময় খাবার ছড়াইতে লাগিল। জগুয়াকে দেখিলে কি জানি কেন, ময়না চিরদিন রাগিয়া যাইত।

জগুয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মহামায়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "কাকে চিঠি লিখ্‌ব? কেন লিখ্‌ব মা?" আবার পরক্ষণেই বলিল, "আমি যে লিখ্‌তে জানি না।"

মহামায়া মনে মনে ভাবিলেন, সে কথা ত ঠিক। ও ত লিখ্‌তে

জানে না ; বলিলেন, "আমরা যে এখান হ'তে চলে যাচ্ছি জগুয়া—তুই কি জানিস্ না ?—তুই কি আমাদের সঙ্গে যাবি ?"

জগুয়া কিছু না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলিল, "কেন মা, আমি কেন যাব না ?"

"তোর কাকা, কি আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে ?"

"তবে আমি কোথায় থাক্‌ব ?"

মহামায়া কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

সে দিনটি মহামায়ার বিশেষ করিয়া স্মরণ হইতেছিল,—যেদিন জগুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথম তাঁহার নিকট আসে, দশ বৎসরের বালক তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে। সেইদিন হইতে সে যে তাঁহার স্নেহ, মমতায় ধীরে ধীরে পালিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তার হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-উল্লাস, সুখ-দুঃখ সব যে মহামায়ার অজস্র স্নেহধারায় পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে ; সুতরাং জগুয়াকে যে এরূপ প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তিনিই দিয়াছেন। এখন তাঁহাকেই ত উত্তর দিতে হইবে, সে কোথায় থাকিবে ?

মহামায়া দৃঢ়স্বরে মনে মনে বলিলেন, "হয় জগুয়া আমাদের সঙ্গে যাবে, নয় তাকে ছেড়ে দেশে যেতে পার্‌ব না।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুই সে দেশে থাকতে পার্‌বি ?"

"তুমি পার্‌বে ?"

"সে যে আমার দেশ।"

"তবে আমারও দেশ।"

প্রথম প্রথম বারমপুর আসিয়া মহামায়ার পৰ্ব্বতগুলিকে নিৰ্ম্মম ও কৰ্কশ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ কোন্ সুন্দর যাদুকরের করস্পর্শে তাহাদের মধ্যে যে নয়নতৃপ্তিকর শোভা বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহা

ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অভাব ও অবসাদের মধ্য দিয়া দীর্ঘ নির্জ্জনতা অনুক্ষণ তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিত বলিয়া তিনি এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু জগুয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের উপর এত মমতা হইল কেন? জানি না কোন্ মনোমোহনের মোহন বাঁশীর সঙ্গীতধ্বনিতে মহামায়া, কোন্ মায়ামোহে এই দেশকে সকল শক্তি দিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে জগুয়া নীরবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সে কাহার সহিত কথা কহিল না, কিছু খাইল না।

প্রভাতের অরুণালোকের উপর সহসা বর্ষার নিবিড় মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

[৫]

তারপর সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। খগেন্দ্রবাবু দেশের দিকে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। মহামায়ার সহিত জগুয়াও আসিয়াছে। মহামায়ার স্নেহে জগুয়ার সম্পর্ক এখানে ঠিক ভৃত্যের মত নয়। সে তাঁহাদের সংসারে সুখদুঃখে সমান অংশী। জগুয়া যখন সুদূর দেশের কথা কখনও কখনও স্মরণ করিত, তখন সে বেশ স্পষ্ট করিয়া তা'র দেশের কথা অনুভব করিতে পারিত না। যে দেশে সে জন্মিয়াছে, সে দেশের প্রতি যে তাহার একটা অন্তর্নিহিত অবিচ্ছিন্ন বন্ধন, আকর্ষণ আছে—তাহার সহিত যে তা'র একটা মাতৃস্নেহের অটুট শ্রদ্ধা ও ভক্তির মঙ্গল-সংযোগ চিরবিদ্যমান রহিয়াছে, সেটা সে মহামায়ার অনাবিল স্নেহ ও মমতায় সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন দেখিত। মহামায়ার নারীত্বের মধ্যে জননীত্ব এই জগুয়াকে লইয়া পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়া-

ছিল ; সুতরাং এই দুইটী হৃদয়ের ভিতর পুত্রের জননীর অভাব কোন-খানেই কেহ অনুভব করিত না।

রান্নাঘরের রকের উপর বসিয়া মহামায়া তরকারী কুটিতেছেন, জগুয়া নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছে। কি কি রান্না হইবে, তাহার সংবাদ লইতেছে। পূজার সময় তাহার কিরূপ জুতা জামা হইবে, তাহারও কথা চলিতেছিল। মহামায়ার একবার অসুখ করিয়াছিল, জগুয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল। তেঁতুলতলার বড় বড় সিঁদুরমাথা পাথরগুলিকে লুকাইয়া লুকাইয়া সে গড় করিত, জোড় হাত করিয়া বিড় বিড় করিয়া অশ্রুবিক্লনয়নে মহামায়ার আরোগ্য প্রার্থনা করিত। জগুয়ার অসুখ-বিসুখ করিলে, মহামায়া এই ঠাকুরের পূজা দিতেন ও তাহাকে প্রণাম করিতে আদেশ করিতেন ; সুতরাং বিদেশী বালকের ধারণা হইয়াছিল, এঁরা মন্দিরে বা বাড়ীতে না থাকিলেও, এঁরা যে খুব বড় দেবতা, অসীম শক্তিশালী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খগেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, বড় বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িতেছে। পূজার সময় একখানি কাপড় দিলেই যথেষ্ট, তা নয়—তাকে জামা দাও, জুতা দাও, কেন এসব আমি দিতে যাই? তাই ত লোকে নানাকথা বলে। এই সব ব্যাপার লইয়া মহামায়ার সহিত খগেন্দ্রবাবুর একটু আধটু খিটিমিটি যে না চলিত, তাহা নয়।

একদিন জগুয়ার কাপড় লইয়া মহামায়া বেশ একটুখানি অভিমান করিয়া বলিলেন, "তোমায় টাকা দিতে হবে না আমি দিব।"

খগেন্দ্রবাবু চটিয়া বলিলেন, "চাকর আবার কোথায় বাবু সাজে? এ সব আস্কারা দেওয়া আমি একেবারে পছন্দ করি না।"

কথাগুলি মহামায়ার অন্তরে আঘাত করিল।

জগুয়া দূরে দাঁড়াইয়া সে সকল শুনিল। মনে মনে কত কি ভাবিল ;

তারপর মহামায়ার দিকে চাহিতেই তাহার রুদ্ধ অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল।

সে কাপড়, জামা, সব ত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। বেচারী কোনদিন ভাবে নাই যে, তার এ অন্যায় আব্দার শুনিবার লোক মহামায়া ভিন্ন এ জগতে আর কেহ নাই। এই ব্যবহারে খগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌লে কত বড় আস্পর্দ্ধা! কাপড়—জামা ফেলে দিয়ে, লাট্‌ সাহেবের মত গট্‌ গট্‌ করে, চলে গেল। মনে ভেবেচে, এখনি ওকে ডেকে এনে বাপু বাছা বল্‌বে?"

মহামায়া বলিলেন, "তুমি ওকে যতটা বাবু মনে কর—ও তা নয়। পরের ছেলে, কেউ নেই, তাই অভিমান-আব্দার আমাদের উপর না কর্‌লে, কার উপর করে বল—নইলে ওর যে মনুষ্য-জীবনটা বৃথা হ'য়ে যায়? তাই অবুঝের মত মাঝে মঝে ক্ষেপে উঠে। এটা ওর পক্ষে খুব স্বাভাবিক নয় কি? দশ বছরের ছেলে, মা-মরা ছেলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যেদিন তোমার কাছে এসেছিল, তখন ত তাড়িয়ে দিতে পার নাই?"

"বেটার কেউ ছিল না, তাই দয়া ক'রে রেখেছিনু, এই না অপরাধ?"

"অপরাধ টপরাধ ও সব কথা বল্‌চ কেন! এখনও ওর কেউ নেই। তখন তোমার দয়া যে কারণে হ'য়েছিল, এখনও সে কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি। দয়া, স্নেহ করা হয় বলেই, না ও অতটা রাগ করে, আব্দার্‌ করে, অভিমান করবার সাহস করে। ও মনে ভাবে এটা যেন ওর নিজের বাড়ী, আমরা যেন ওর আপনার জন।"

"এতটা হতো না, কেবল তোমার আস্‌কারা পেয়ে ও বেড়ে উঠেছে? তুমি সকল কথা জান না, পাড়ার লোকে এ সব ব্যাপার নিয়ে বিদ্রূপ

করে,বলে,‘চাকর—চাকরের মত থাক্‌বে’, সে কথা যে তা’রা অন্যায় বলে,তা বল্‌তে পারি না। নন্দকাকা সেদিন ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিলেন, ‘অমন বাবু চাকর রাখ্‌লে, আমাদের চাকর-বাকর রাখা দায় হ’য়ে পড়্‌বে। চাকর ত নয়, যেন নন্দদুলাল’।”

মহামায়া স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “বাড়ীর ছেলে, আদুরে হবে না ত কি? আমাদের আশ্রয়ে যে আছে, তা’র কপালে কি চাকরের টিকিট মেরে দিতে হবে? লোকের এ সব কথা বলা বড় অন্যায়।”

খগেন্দ্রবাবু গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

বৈকালে জগুয়া ফিরিয়া আসিল। ফুলগাছগুলির গোড়া অল্প অল্প নিড়ান করিয়া দিল। পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহাদের গোড়ায় ঢালিল। বাড়ী, ঘর, দ্বার সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিল—কাহারও আদেশের জন্য মোটেই সে অপেক্ষা করিল না। সে যখন এমন করিয়া জোর করিয়া সংসারে তাহার দাবী সাব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল; সকল গালাগালি, অপমান বিস্মৃত হইয়া মহামায়ার নিকট আসিয়া উপবেশন করিল, তখন মহামায়া অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন—দেখিলেন সেখানে কিছুমাত্র অসন্তোষের চিহ্ন বিদ্যমান নাই। সে যেন তাহাদের একজন হইয়া গিয়াছে—এরূপ ভাবিতে তার কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। সে এ সংসারে কিছুতেই কোন দিক্ হইতে আপনাকে চাকর ভাবিতে পারে না। তিনি মনে মনে বলিলেন, আর কেনই বা সে এমনটা ভাব্‌বে? চাকর হইয়া ত কেহ জন্মায় না? তবে কেন লোকে তাকে চাকর বলবে?

[৬]

বকুলগঞ্জের সকলেই কিন্তু জগুয়ার মত একজন বিশ্বাসী পরিশ্রমী,

চাকর পাইবার নিমিত্ত খগেন্দ্রবাবুকে মনে মনে ঈর্ষা করিতেন। প্রকাশ্যে খগেন্দ্রবাবুর নিকট জগুয়ার যথেষ্ট নিন্দা করিতেন। জগুয়া একদিকে যেমন একটু স্বাধীন ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ তা'র কাজকর্ম্মের তুলনা ছিল না। সংসারের সকল কাজের মধ্যেই জগুয়ার পরিশ্রম পরিদৃষ্ট হইত। বাড়ীখানি দর্পণের মত ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিত। কোনখানে একটুও আবর্জ্জনা জমিতে পাইত না।

সে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া বাগানের আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থলে নানাবিধ শাকসব্‌জি বুনিত। নানারকম ফলের গাছ রোপণ করিয়া বাগানের শোভাসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে বহুবিধ ফুলের গাছ বসাইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই সকল কাজকর্ম্ম দেখিয়া অনেকেই জগুয়াকে অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া, তাহাকে খগেন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে ছাড়াইয়া আনিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল! জগুয়া হাত পাতিয়া কোনদিন মাহিনা লয় নাই। টাকার কি মূল্য বা তাহার কি আকর্ষণ আছে, এমন অভাব তাহার কোনদিন আসে নাই, যাহাতে সে এরূপ প্রলোভনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত। সুতরাং সে এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। সে বাড়ীতে আসিয়া মহামায়ার নিকট বলিত, "মা আমায় ওরা চাকর রাখ্‌তে চায়, বেশী মাহিনা দেবে বলে।" বলিতে বলিতে সে রাগিয়া একবারে বালকের মত চুপ করিয়া বসিত। মহামায়া জগুয়ার অন্তর বিলক্ষণ বুঝিতেন। কথাটা বেচারীর অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা দিয়াছে জানিয়া, তাহাকে আদর করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন, "বল্লেই বা চাকর, তাতে ক্ষতি কি? মহামায়া বলিয়াছেন—ক্ষতি নাই, তবে নিশ্চয়ই ক্ষতি নাই—ভাবিয়া সে তখন আনন্দে গলিয়া যাইত।

জগুয়া যখন এমনই করিয়া সমস্ত সংসারটিকে আপনার অধিকারে

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন খগেন্দ্রবাবু তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। একদিন সামান্য কারণে মহামায়ার উপর অভিমান করিয়া জগুয়া একখানি নূতন থালা ক্রোধভরে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। থালা ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া গেল। খগেন্দ্রবাবু তখন বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। এই অন্যায় আচরণে সেদিন তিনি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া তাহাকে দুই এক ঘা প্রহার করিলেন। সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেদিন কিন্তু সে আর বাড়ী ফিরিল না। মহামায়ার প্রথমটা জগুয়ার উপর রাগ হইয়াছিল; কিন্তু যখন বেলা পড়িয়া আসিল—আহারের সময় উত্তীর্ণ হইল, তবুও জগুয়া আসিল না, তখন তাঁহার ক্রোধ অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বারবার সদর দরজায় গিয়া জগুয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন—বাগানের ধারে গিয়া কতবার জগুয়ার অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু সেদিন কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্রমে সূর্য্যদেবের কিরণ ক্ষীণপ্রভ হইয়া ধরণীর বক্ষ হইতে গাছের মাথায় গিয়া ঠেকিল। রাখালেরা গরু লইয়া গৃহে ফিরিল। কুলবধূরা পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া জল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তুলসীর মূলে গৃহিণীরা প্রদীপ দেখাইল। মন্দিরে, দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইল—অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তবুও জগুয়া গৃহে ফিরিল না।

জগুয়ার প্রতি মহামায়ার স্নেহ ক্রমেই খগেন্দ্রবাবুকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। সেবার মহামায়া বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলে তবে জগুয়াকে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু এবার সামান্য ত্রুটী পাইলেই তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন, ঠিক করিয়া রাখিলেন।

ইহাতেও কিন্তু জগুয়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সে যদি নিজেকে কোনদিন খগেন্দ্রবাবুর ভৃত্য বলিয়া মনে ভাবিতে পারিত, তাহা হইলে খগেন্দ্রবাবুর আচরণ তাহাকে বহু পূর্ব্বেই সতর্ক ও সাবধান করিয়া

দিত ; কিন্তু এরূপ চিন্তা কোনদিন তাহার মাথায় মোটেই আসিত না ; সুতরাং আপনাকে সংশোধন করিবার একবারেই প্রয়োজন আছে, এমনটাও সে মনে করিতে পারিত না। এখন হইতে তাহার তুচ্ছ ত্রুটিগুলি খগেন্দ্রবাবুর চক্ষে বেশ বিশেষত্ব লইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন বৈকালে খগেন্দ্রবাবু একখানি পুস্তক পড়িতেছেন ; মহামায়া পাশে বসিয়া কি একটা বুনিতেছেন। উঠানের একপার্শ্বে একটা কুকুর শুইয়া আছে ; জগুয়া কোথায় গিয়াছিল, বাড়ীতে ছিল না, একটু পরেই সে আসিয়া পড়িল, এবং আসিয়াই একখানি বড় ইঁট ছুড়িয়া অকারণ কুকুরটিকে প্রহার করিল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে সেখান হইতে পলাইল।

খগেন্দ্রবাবু পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "কেন তুই ওকে মারলি ? তুই মনে ভেবেচিস্ কি ?"

"এত ক'রে উঠান পোস্কের ক'রে গেনু, উনি আরাম করে শোবেন বলে নাকি ?"

খগেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার উত্তর দেওয়া হচ্চে—বেটার লজ্জা নেই !" তারপর মহামায়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জগুয়াকে আর আমাদের রাখা পোষাবে না, ওর মাইনেপত্র চুকিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ও পাপের আর এখানে থাকা চল্‌বে না।"

মহামায়া তখন কোন উত্তর দিলেন না। খগেন্দ্রবাবু পুনরায় বলিলেন "দেখ, মহামায়া, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আসল কথা আমি ওকে রাখ্‌ব না।"

মহামায়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষে বোধ হয় জল আসিয়াছিল। খগেন্দ্রবাবু তাহা দেখিতে পাইলে ব্যাপার যে আরও গুরুতর দাঁড়াইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহামায়া চলিয়া গেলে খগেন্দ্রবাবু আরও রাগিয়া গেলেন। সকল কাজের অপেক্ষা যেন জগুয়াকে তাড়ানই তাঁহার বেশী হইয়া পড়িল।

[৭]

বৈশাখ মাস। কয়দিন হইল বসন্ত বিদায় লইয়া পল্লীভবন হইতে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে এখনও তাহার অনুরাগ প্রকৃতির নবীনতার মধ্যে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে। উৎসবগৃহে এখনও বসন্ত-সঙ্গীতের শেষ রেষ বেশ মিলাইয়া যায় নাই। আকাশে এখনও নীল মেঘের উপর বসন্তের আবীর দাগ ধুইয়া যায় নাই। কোকিল এখনও পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া কুহু রবে দিক্ মুখরিত করিতেছে। এই সময় নন্দবাবুর বাড়ীতে একটি বিবাহ উপস্থিত হইল।

এই বিবাহ উপলক্ষে নন্দবাবু, খগেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে খগেন, তোমার চাকরটাকে আজ সন্ধ্যে বেলা তামাক টামাক দিতে ব'লে দিও। ভদ্রলোকেরা আস্‌বেন, যাতে খাতির-টাতির হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখ, তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব বল ?"

খগেন্দ্রবাবু জগুয়াকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আজ নন্দকাকার বাড়ী বিয়ে আছে, তুই সেখানে যা, কাজকর্ম্ম দেখে শুনে কর্‌বি ? সকলকে তামাক-টামাক দিবি, বুঝ্‌লি ?"

নন্দবাবুর উপর জগুয়ার পূর্ব্ব হইতে রাগ ছিল। তাঁহাকে সে নানা কারণে দেখিতে পারিত না। একবার নন্দবাবু তাহাকে অধিক মাহিনা দিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; সুতরাং জগুয়া খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর করিল, "আমি তামাক সাজ্‌তে পার্‌ব না। আমি কি চাকর যে, পরের বাড়ী গিয়ে তামাক সাজ্‌ব ?"

খগেন্দ্রবাবু রাগিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "এখনি তুই বাড়ী থেকে বের বলচি, পাজি ব্যাটা।"

জগুয়ার মন তখন অভিমানে পূর্ণ হইয়াছিল। এতদিন পরে সহসা যেন আজ তার কেমন অপমান বোধ হইল। বেচারী আর কোন কথা বলিল না। রাগ করিয়া তখনই সে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, মহামায়া একটু পরে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে ; কিন্তু সে আর কিছুতেই আসিবে না। ইতোপূর্ব্বে সে একদিন খগেন্দ্রবাবুর নিকট প্রহার পর্য্যন্ত খাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয় নাই বা অপমানিত মনে করে নাই। আজ নন্দবাবুর বাড়ী তাহাকে চাকরের মত তামাক সাজিতে হইবে, এ হীনতা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। কথাটা মনে করিতেও তার ঘৃণা হইতেছিল। সত্য সত্যই সে বাড়ী ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার মাথার ভিতর একসঙ্গে নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তখন সে ধীরে ধীরে এক পরিত্যক্ত চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইল। অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। বিবাহ বাড়ীর উৎসব-আনন্দের কোলাহল ক্ষীণতর হইয়া তাহার ঘুমঘোরের মধ্যে যেন মহামায়ায় করুণ আহ্বানের মত শুনাইতেছিল। ভোরের বাতাসে যখন সানাইএর মৃদুমধুর রাগিণী অল্প অল্প শোনা যাইতেছিল, জগুয়া কি স্বপ্ন দেখিয়া তন্দ্রাবস্থায় বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, মা তুমিই বল, আমি কি চাকর যে, যার তার তামাক সাজ্‌ব, জল তুল্‌ব ? আমি যে, তোমার ছেলে, তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।" এই সময় পার্শ্বের জানালা হইতে একটি বালক উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে কানাই, দেখ্‌বি আয়, আমাদের খেলাঘরে কে ঘুমিয়ে কত কি বক্‌চে।" তাহাদের কথাবার্ত্তায় জগুয়ার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া

দেখিল, সকাল হইয়া গিয়াছে। তখন সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

[৮]

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকার নিবিড় কাল মেঘের জাল ফেলিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবালে সূর্য্যাস্তের সুবর্ণরেখার ক্ষীণ ম্লান আভাটুকু অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। শ্যামল বনরাজির অভ্যন্তরে নিবিড় অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতেছিল; মহামায়ার সুবর্ণোজ্জ্বল মুখকান্তির উপর বিষাদছায়া পড়িয়া যেন সমস্ত সংসারটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল।

তিন মাস জগুয়া আর আসে নাই। সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মহামায়া পুত্রহারা জননীর মত উদাসীন হইয়া কত কি ভাবেন। খগেন্দ্রবাবুকে আর জগুয়ার কথা একবারও বলেন না। খগেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মহামায়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। সে উৎসাহ, সে হাসি, সে বিদ্রূপ আর কিছুই নাই। কোন প্রকারে যেন তিনি সংসারে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে প্রয়াস পাইতেছেন। কোন কোন দিন মহামায়া দুই ঘণ্টার অধিক কাল জানালার ধারে গিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছেন। এক একদিন আহারে উপবেশন করিয়া কি ভাবিয়া তখনই উঠিয়া পড়েন, আর আহার করেন না। খগেন্দ্রবাবু এই সকল ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। জগুয়া থাকিতে যতটা তার উপর রাগ হইত, এখন আর ততটা রাগ নাই। এক একবার মনে মনে আশঙ্কা হয়—সে বিদেশী এ অঞ্চলে তাহার কেহ নাই—হয় ত কেহ বিশ্বাস করিয়া তাহাকে কাজ না দিতেও পারে, তাহা হইলে সে কি না খাইয়া মরিবে? তাহাকে মারিবার জন্যই কি আমি

সঙ্গে করিয়া এ বাঙ্গালা মুলুকে নিয়ে এসেছিনু। মহামায়া যদি খগেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন, জগুয়ার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ-উপরোধ করিতেন, তাহা লইলে হয় ত খগেন্দ্রবাবু জগুয়ার জন্য এতটা ভাবিতেন না। তিনি ইহার মধ্যে একবার জগুয়ার সন্ধান করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন সংবাদই পান নাই। সে কথা মহামায়ার নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

[৯]

ইহার কিছু দিন পরে খগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দুই ক্রোশ দূরে ডাক্তারের বাড়ী। রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। তখন দুই বেলা ডাক্তারের নিকট যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকেরা দুই একদিন করিয়া যখন বুঝিলেন, ব্যায়রাম কঠিন, সারিতে অনেক দিন লাগিবে,তখন আর বড় একটা কেহ দেখা দিতেন না। মহামায়া পয়সা দিয়া লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন ; কিন্তু ডাক্তার তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেন না। মহামায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। খগেন্দ্রবাবু একদিন বিকারের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন, “মহামায়া, তুমি অত ভেব না—আমি একবার সেরে উঠি, তারপর এদেশে আর থাক্‌ব না। জগুয়া যদি একবার ডাক্তারকে ডেকে আন্‌ত।”

মহামায়া বহু কষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন, পাছে চোখের জল পড়িলে স্বামীর অমঙ্গল হয় ; কিন্তু তাঁহার বুকের বেদনায়, তাঁহার আঁখিপল্লব সিক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ডাক্তার আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। এ কয়দিন মহামায়া তাহাদের একজন প্রজা ঠাকুরদাসকে ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে নিরক্ষর, সকল কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না। অনেক সময় অনেক কথা মনেও রাখিতে পারিত না। ডাক্তার

ইহাতে বড় রাগ করিতেন। দশখানি গ্রামের ভিতর তিনি একমাত্র পাস-করা ডাক্তার; সুতরাং ম্যালেরিয়া-অভিশপ্ত পল্লীগ্রামে তাঁহার অপরাহ্নের পূর্ব্বে কোন দিন আহার হইত না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সকল বাড়ী প্রতিদিন যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

ঠাকুরদাস আবার গত রাত্রি হইতে জ্বরে পড়িয়াছে; প্রতিবাসীদের সাক্ষাৎ একরূপ নাই বলিলেই চলে। মহামায়া কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আজ জগুয়ার অভাব তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বেদনা দিতে লাগিল। মনে মনে জগুয়ার উপর অত্যন্ত অভিমান হইল। তার কি দয়া মায়া নাই? আজ তিন মাস চলে গেছে, তা একটিবারও কি সংবাদ নিতে নেই—পেটের ছেলে হ'লে কি, সে এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ত?

এই সময় আবার খগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "জগুয়া, তুই কারও কথা শুনিস্‌নি—আমি সেরে তোর জামা কাপড় কিনে দিব।"

এ-কথায় মহামায়ার চক্ষে জল আসিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "জগুয়া ত এখানে নাই—তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌চ?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে খগেন্দ্রবাবুর জগুয়ার কথা আগাগোড়া স্মরণ হইল। তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিলেন; সে দৃষ্টি অপরাধীর দৃষ্টির মত। তারপর পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটিও কথা বলিলেন না।

[১০]

সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে বৃষ্টি আরও জোরে হইতে লাগিল। মহামায়া অনেক চেষ্টা করিলেও, সে ভীষণ জলে, তিন ক্রোশ পথ কাদা ভাঙ্গিয়া কেহ বাড়ীর বাহির হইতে স্বীকার করিল না।

বৈকাল হইতে খগেন্দ্রবাবু মোটেই আর কথা বলিলেন না। মহামায়া অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।

রাত্রে মহামায়া দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি বাগানের দিকে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পতনের শব্দ হইতেছিল। মাঝে মাঝে মেগর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। মহামায়ার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, আজ যদি জগুয়া থাকিত, তবে কি আর সে জল-ঝড় মানিত, না লোকের খোসামোদ করিয়া হতাশ হইতে হইত। ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সেই ক্ষণস্থায়ী আলোক রশ্মিতে মহামায়া দেখিলেন, তাহাদের বাতায়নের নিম্নে যেন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ভিজিতেছে। মহামায়া চোর বলিয়া প্রথমে আশঙ্কা করিলেন ; কিন্তু পর ক্ষণেই মনে হইল,জগুয়া নয় ত ? নিশ্চয় জগুয়া, জগুয়া না হ'লে যায় না ; তিনি ডাকিলেন, "কেরে দাঁড়িয়ে ভিজ্ চিস্ ? জগুয়া না কি ?"

ক্ষীণস্বরে কি উত্তর আসিল, জলের শব্দে মহামায়া বুঝিতে 'পারিলেন না, তবে সে এক পদ সরিল না, তেমনই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জানালার দিকে চাহিয়া ভিজিতে লাগিল। মহামায়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে চিনিলেন, সে আর কেহ নয়,—তাহার জগুয়া। তিনি অধীর-কণ্ঠে ডাকিলেন, "ওরে জগুয়া শীগ্‌গির আয়, তোর বাবুর বড় অসুখ।" তারপর তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে করিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

খগেন্দ্রবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ রে জগুয়া, এতদিন কি রাগ ক'রে থাকৃতে হয় ?"

এ কথা মহামায়া সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলেন ও অঞ্চলে নয়ন মুছিলেন।

দ্বার খুলিয়া মহামায়া দেখিলেন—জগুয়া। তার সমস্ত শরীর দিয়া জল গড়াইতেছে। সে কি ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মহামায়াকে দেখিয়া জগুয়া একবারে কাঁদিয়া তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল—একটিও কথা বলিল না। মহামায়াও কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "উপরে চল্, তোর বাবুর বড় অসুখ।"

জগুয়া মহামায়ার পশ্চাতে পশ্চাতে উপরে আসিল। খগেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গৃহের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—তাহার মুখ হইতে একটীও কথা বহির্গত হইল না।

মহামায়া জগুয়ার হাত ধরিয়া স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, জগুয়া এসেছে, তুমি তাকে ডাক্‌ছিলে কেন?"

জগুয়ার নাম শুনিয়া রোগক্লিষ্ট শীর্ণদেহে খগেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন "ওকে খেতে দাও, খেতে দাও, বড় রোগা হ'য়ে গেছে।"

জগুয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে তেঁতুলতলায় মহামায়ার নির্দ্দিষ্ট পাথরের দেবতাগুলির নিকট গিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে, তার বাবুর জন্য কাঁদিয়া পড়িল। গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া, সে মহামায়ার হস্তে একটি ফুল দিল। মহামায়ার মুখ হইতে কি জানি কেন আশঙ্কার ভাব দূর হইয়া গেল।

বুড্ঢা

"আচ্ছা ঘোড়াটা কি বুড়ো?" জিজ্ঞাসা করিয়া সুনীতি মৃদুমধুর হাসিয়া পানের ডিবাটি স্বামীর হস্তে দিল ও মস্তকের উন্মুক্তপ্রায় অবগুণ্ঠন অল্প টানিয়া দিয়া সম্মুখে উপবেশন করিল।

শৈলেশচন্দ্রও তেমনই মৃদু হাসিয়া বলিল "সকল জিনিষ তোমার বিজ্ঞতার গুণে খুব শীঘ্র পুরাতন হলেও, ঘোড়াটি যে যৌবনে এরূপ একটী উপাধি লাভ করিতে পারে, তাহা যে কেহ ঘোড়া দেখবে, সে স্বীকার কর্ত্তে পারবে না; কিন্তু—"

"ওগো—থাম,থাম, 'কিন্তু'র প্রয়োজন নাই। বলি, তবে ওকে বুড্ঢা বলে কেন?"

"এই যে তোমাকে সকলে বুড়ীমা বলে, তাই বলে কি তুমি—" সুনীতির রক্তগোলাপ আভ কপোল অল্প আরক্তিম হইল। বলিল,"যাও।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বুড্ঢা বুঝি তবে ওর নাম?"

"অনেক সময় গুণ দেখে নাম রাখা হয়, এক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই হবে। এই বোঝ না, তোমার নাম সুনীতি; কিন্তু এ বাড়ীতে কেউ তোমায় ওনামে ডাকে না—সবাই তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী বলে—অবশ্য আমার কাছে ও লক্ষ্মী নামটা মোটেই ভাল শোনায় না। তার কি?"

[২]

আশ্বিন মাস, শরতের পরিষ্কার আকাশের কোনখানে একটুখানি মেঘের চিহ্ন মাত্রও নাই। রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে একটা অজানা আনন্দের

আগমন সর্ব্বদিক হইতে মধুর আভাস দিতেছে। স্বর্ণাভ রৌদ্র ও শীতোষ্ণ সমীরণ সারা বছরের দুঃখ-দৈন্য, বিরহ, বেদনা ঘুচাইয়া যেন সকলকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই যেন সেই শরৎকালের প্রতীক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত সান্ত্বনার প্রত্যাশায় এই দীর্ঘ বারমাস অতিবাহিত করিয়াছে। তৃণে, লতায়, জলে, স্থলে, আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্রই একটা হর্ষ ও উল্লাসের বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পূজার আর অল্প দিন মাত্র বাকী আছে। পনের দিন বাকী থাকিতেই শৈলেশ-চন্দ্রকে তাহার কর্ম্মস্থান লাহোর গমন করিতে হইবে। আজ কয়েক দিন সেই প্রশ্ন লইয়া সুনীতির সহিত মহাসংগ্রাম চলিয়াছে—প্রতিদিন মন্ত্রীসভা আহূত হইতেছে এবং প্রতিসভায় শৈলেশচন্দ্রের সহস্র যুক্তি, সহস্র তর্ক নির্দ্দয়ভাবে পরাস্ত হইতেছে—এই সময় একদিন শৈলেশচন্দ্র 'বুড্‌ঢা'কে কিনিয়া আনিল এবং 'বুড্‌ঢা'র নামটীও বিশেষ করিয়া সুনীতির নিকট সংসারের অপরাপর লোকের নামের সহিত তালিকাভুক্ত করিয়া দিল।

একদিন সুনীতি বলিল, "তুমি যখন চলে যাচ্ছ, তখন এ ঘোড়া কেন্‌বার কি প্রয়োজন ছিল?"

শৈলেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি চলে গেলে যদি ঘোড়া অনাবশ্যক মনে কর, তবে অনেক জিনিষ ত সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অবর্ত্তমানে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে—তবে সেগুলিও রাখবার প্রয়োজন কি?"

"তাহাদের নইলে চলে না, তাহারা যে সংসারের, তাহাদের ত্যাগ করলে, যে সংসার অচল হয়ে পড়ে, একদণ্ড দাঁড়াতে পারে না।"

শৈলেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, সংসার বল্‌তে কেবল তারা,—যারা রাঁধে বাড়ে, পড়ে শোনে, কাজকর্ম্ম করে, টাকা উপার্জ্জন করে এবং মানুষের মত দু'হাত, দু'পা নিয়ে ঘর করে—কেবল

তাহারাই সংসারভুক্ত পল্টন, তাহারা ভিন্ন আর অপর কেহ সংসারভুক্ত হবার অধিকার পর্য্যন্ত রাখে না; আর যদি রাখে,তবে সে কেবল অনর্থক, অনাবশ্যক ভাবে, তৈলচিত্রের 'কেন্‌ভাস' বহু বর্ণে আত্মগোপন করে—আপন বক্ষের উপর নয়নবিমোহন সৌন্দর্য্যের অনন্ত মাধুর্য্য বন্দী করে বলে কি—'কেনভাসের' কোন মূল্য বা প্রয়োজন নাই ?"

সুনীতি তর্কের মাত্রা মৃদু করিয়া দিয়া বলিল—"অবশ্য প্রয়োজন আছে; কিন্তু তরণীর উপর সহস্র দাঁড়ী থাকিলেও, একজন মাঝির অভাবে তাহারা অনাবশ্যক নয় কি ?"

ইহা শুনিয়া শৈলেশচন্দ্র আনন্দদীপ্তনয়নে সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন, কি যেন অনুসন্ধান করিলেন—তারপর শৈলেশের প্রেমব্যাকুল দৃষ্টি, সুনীতির প্রণয়-উজ্জ্বল নয়নপথে অন্তরের গুপ্তদ্বারে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, বলিল, "ওগো ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

পূজার সময় শৈলেশচন্দ্রের লাহোর যাওয়া হয় নাই। টেলিগ্রাম করিয়া আর ছয় মাসের ছুটী সে মঞ্জুর করিয়া আনিয়াছিল। সংসার-রাজ্যের প্রধান সচীব সুনীতি সে দিন হাসিতে হাসিতে আসিয়া যখন শৈলেশের পড়িবার কক্ষে উপনীত হইল ও বলিল "নমস্কার মহাশয়, একজন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হুজুরের সাক্ষাৎ মানসে দাঁড়াইয়া আছে—কেতাব হ'তে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিতে আজ্ঞা হউক।"

শৈলেশচন্দ্র একমনে একখানি ইংরাজী উপন্যাস অধ্যয়ন করিতেছিল, সুনীতির আগমন সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই—অকস্মাৎ একেবারে ওয়ারেণ্টের আসামীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পরে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"না বলিয়া বা কার্ড না পাঠাইয়া

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করা আধুনিক সভ্যতার হিসাবে আপনার পক্ষে যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে জানবেন।"

সুনীতি তখন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে গৃহভিত্তি গাত্রে বিলম্বিত চিত্রগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিল এবং যেগুলির উপর ঝুল বা ধূলা জমিয়াছিল, সেগুলি পরিষ্কার করিতেছিল।

একখানি ফটোগ্রাফের নিকট দাড়াইয়া সে অনেকক্ষণ দেখিল, তারপর কি জানি কেন সহসা লজ্জায় তাহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে পেরেক হইতে ছবিখানি খুলিয়া মেঝের উপর রাখিল এবং অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে অপরাপর কাজের ভিতর শৈলেশের প্রশ্নটিতে কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান না করিয়া উত্তর করিল—"কার্ড না পাঠাইয়া আসা যে অভদ্রোচিত সে শিক্ষাটি এত দিন বেশ উপলব্ধি কর্‌তে পারি নি—তবে সেদিন মহাশয়ের বন্ধুবাড়ী নিমন্ত্রণে যাইয়া কার্ডের গুরুত্ব বুঝে এসেছি। এখন থেকে যদি মহাশয়ের সহিত দেখা করতে কার্ডের প্রয়োজন হয়, তবে খানকয়েক ছাপিয়ে এনে দেবেন, যা মূল্য হয় দেব।"

"ভাল কথা, নরেনবাবুর স্ত্রী কমলা কেমন যত্ন করলেন? তিনি ভারি শিক্ষিতা ও 'আপ্‌ টু ডেট্‌?' বেশ মানুষ?"

সুনীতি চাবির রিং-সংবদ্ধ অঞ্চলখানি অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে নিকটে আসিয়া বলিল, "তাঁর নাম তোমার নিকট শুনেছিলাম; কিন্তু কখনও চক্ষে দেখিনি। আমার সঙ্গে দেখা হবামাত্র আমাকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি এ ব্যাপারে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেলুম—সে ভাবটা বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হবার অবসর না দিয়া বল্লেন—"আসুন আসুন, আপনার সঙ্গে যদিও আমার চাক্ষুষ দেখা ছিল না তথাপি—তোমার নাম

ধরে বল্লেন—তোমার নিকটে আমার অনেক সুখ্যাতি শুনেছেন। আমি মাথা অবনত করে রইলাম। তিনি বল্লেন, "কেমন আছেন? আজ আমাদের এই শুভ সম্মিলনে যোগদান করে আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করেছেন।" এমন সময় একজন বেহারা আসিয়া একখণ্ড মসৃণ কাগজ তাঁহার হস্তে দিল। জানি না তাহাতে কি লেখা ছিল—তিনি সহসা খুব ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ভাই তুমি একটুখানি বসো, মিসেস সরোজিনি গুপ্ত দ্বারে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে নিয়ে আসি" বলিয়া তিনি অত্যন্ত দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন। 'আপনির' হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।"

শৈলেশ এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল "তারপর তুমি কি ভাব্‌লে?"

"ভাবলেম—বোধ হয় কেউ পীড়িত হয়ে পড়েছেন ভিতরে আসতে পাচ্ছেন না, তাই তাকে ধরে আন্‌তে গেলেন।"

এই কথা শুনিয়া শৈলেশচন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"পীড়িতা স্ত্রীলোক যখন এলেন, তখন বোধ হয় তোমাদের আমোদ-আহ্লাদ সব বন্ধ হ'ল, ডাক্তার ডাক্‌বার জন্য অত্যন্ত কোলাহল পড়ে গেল, কেমন?"

বিশেষ গম্ভীরভাবে শৈলেশ একথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেও, তাহার প্রশ্নের ভিতর যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নিহিত ছিল, তাহা খুব সহজেই সুনীতি বুঝিতে পারিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিল—"মিসেস গুপ্তকে যখন দেখ্‌লাম বুট পায়ে খট্‌ খট্‌ করে হাসতে হাসতে চলে আস্‌ছেন, তখন ভাবলাম ইতিমধ্যে তিনি কেমন সাম্‌লে নিয়েছেন; কিন্তু আমার যেন অসুখ করতে লাগল।

"কেন?"

"সকলেই লেখাপড়া জানেন। 'আপনি আপনি' করে কথাবার্ত্তা বলেন, এবং তাঁদের সকল কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। আমেরিকায় বিলাতে কি হয়েছে, স্ত্রীলোকেরা কতখানি উন্নতি করেছে, ভারতবর্ষ সে তুলনায় কতখানি পিছাইয়া আছে—ক্ষুদ্র সংসারে অপরিসর অন্দরমহলগুলি যে জেলখানা—সেখানে একটু-খানি মাত্র স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই—বাতাস নাই—আলো নাই কেবল প্রাচীর ও সংস্কার, সমাজের ও নিয়মের বেড়া—চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়েছ ওঁ তোমার শীলতা-সম্ভ্রম এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে যায়—এখনও যে সমাজের এ কুসংস্কার দূর হয় নাই, তার উন্নতি আর কোথায়? এসব কথা শুনতে শুনতে অস্থির হয়েছি।"

শৈলেশচন্দ্র খুব উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া সুনীতিকে হাত ধরিয়া তাহাতে বসাইয়া আপনার চেয়ারখানি তাহার সন্নিকটে টানিয়া লইয়া বলিল—"বা বেশ! একদিনে খুব উন্নতি হয়েছে, তুমি অনেক বড় বড় কথা শিখে এসেছ দেখ্‌ছি। সংসর্গের গুণ নেই কে বলে?"

"গুণ আবার নেই? খুব আছে, টের পাচ্ছ না। কত বড় পণ্ডিত হয়েছি। সে দিন কিন্তু আমার এমন মাথা ধরেছিল যে, রাত্রিতে ঘুমাই নি। কেবলই তন্দ্রাঘোরে সেই উৎসব-গৃহকে স্বপ্নে দেখেছি।"

"তাহলে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল বল?"

"এরূপ সমাজের সঙ্গে মেশা অভ্যস্ত না থাকায় অত্যন্ত বাধ বাধ ঠেকেছিল। কেবল নিজের অজ্ঞতাই আমার অভাব ও অক্ষমতাকে সর্ব্বদিক হতে নির্ম্মমভাবে প্রকাশ করে, রাজসূয়যজ্ঞে দুর্য্যোধনের অকারণ অপমানের মত আমারও অভিমানকে বারংবার অন্যায়ভাবে ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল।"

"তবে কি কমলা ভাল করে আদরযত্ন করে নাই?"

"ওইখানে মস্ত ভুল করছ, তিনি একলা কেন, সকলে মিলে বিশেষ" করে আমার দিকে লক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। আমি নূতন মানুষ ব'লে তিনি সকলের নিকট আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। এবং এই পরিচয় হাঙ্গামাটা আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিব্রত করেছিল। যাক্ ওসব কথা, সেদিন বড় মজা হয়েছিল।"

"আমি না শুনে বল্‌তে পারি।"

"কি বল, দেখি তুমি কেমন জ্যোতিষী?"

"তোমার সৌন্দর্য্য দেখে সকলে বুঝি আমায় খুব ভাগ্যবান্ মনে করেছিল?"

সুনীতি মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল— "যাও! সব কথায় বিদ্রূপ। আমি বলতে চাই না!"

শৈলেশচন্দ্র দেখিল, সুনীতি অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছে, সুতরাং বলিল "আমার চক্ষে তোমাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখি কি না—তাই স্বভাবত; ঐকথাই মনে পড়ে। এতে তোমার রাগ হ'লে আমার প্রতি বড় অন্যায় করা হয়।" তারপর স্নেহ, আগ্রহ ও বিনয়সহকারে সুনীতির হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি মজা হয়েছিল, বল।"

মেঘাবৃতরজনীতে সহসা শশধরের আবির্ভাবে যেমন নিমেষে সকল অন্ধকার অপসারিত হয় সেইরূপ স্বামীর মধুর সম্ভাষণে তাহার সকল অভিমান অচিরে দূর হইয়া গেল।

সুনীতি পুনরায় উপবেশন করিল, বলিল "বুড্‌ঢাটা সেদিন আর একটু হলে, পথের মাঝে লোকের সামনে দাঁড় করিয়েছিল আর কি?"

"কেন? এমন ছুটে ছিল, যে গাড়ী উল্টে যাবার জোগাড় হ'য়েছিল বুঝি?"

"তার চেয়ে বেশী, মাগো! এখনও সেকথা মনে হ'লে গা কাঁপতে থাকে।"

"তোমার অত্যন্ত ভয় হ'য়েছিল দেখ্‌ছি।"

"এমন অবস্থায় পুরুষজাতির যে বিশেষ সাহস হয়, তা'ত জানি না।"

"তুমি কি করলে?"

"পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যা' করে, আমিও তার বেশী কিছু করিনি" বলিয়া সুনীতি মেঝের উপর নামান ছবিখানি লইয়া গমনোদ্যত হইলে—শৈলেশচন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি বুড়্‌ঢা করলো অপরাধ, আর ছবিখানিকে তাড়াতাড়ি কি অপরাধে নির্ব্বাসিত কর্‌তে চল্লে।"

"ওতে আমার ছবি আছে, সুতরাং বাহিরের ঘরে সাধারণের সামনে ওর স্থান হ'তে পারে না।"

"মন্দ কথা নয়, ওতে আমারও যথেষ্ট লাভ আছে। কি জানি কে আবার ছবি দেখে—"

সুনীতি স্বামীর মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "যাও, আর কখন তোমার পড়বার ঘরে আসব না।"

"সে ভাল কথা। তুমি কি মনে করেছ আমার পায়ে বাত হয়েছে যে, আমি অন্দরে তোমার শয়নকক্ষে পৌঁছিতে পারব না?"

সুনীতি কোন উত্তর না দিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

[৩]

সেদিন সুনীতি যখন কমলাদের বাড়ী হইতে বাহির হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ গুপ্তও গাড়ীতে উঠিলেন। মিসেস্ গুপ্তর গাড়ী সুনীতির গাড়ী ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বেই ছাড়িল—প্রায় একসঙ্গে বলিলেও হয়।

যাইবার সময় তিনি গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। অল্পদূর আসিয়া বুড়্টা কি ভাবিল এবং উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সুনীতি মনে করিল—লক্ষ্মীছাড়া বুঝি ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কিন্তু তা নয়। মিসেস গুপ্তর গাড়ী যে তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই তার অভিমান বা অপমান। কোচম্যান কিছুতেই বুড়্টাকে বশে আনিতে পারিতেছিল না। চারিদিকে লোকজন, পথে হাজার হাজার গাড়ী চলিয়াছে; কিন্তু হতভাগার অন্য কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মিসেস গুপ্তর গাড়ীখানিকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিয়াছিল, ততক্ষণ সে তার সমগ্র পশুশক্তি জয়পরাজয়ের তীব্র নেশায় নিয়োগ করিয়াছিল। সুনীতি আশঙ্কায় একবার সম্মুখ দিকের 'পাকি'গুলি খুলিয়া নীরব ও হতাশভাবে কোচম্যানের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল কিন্তু সেখান হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল না। পরক্ষণেই পশ্চাতে সরিয়ারাস্তার দিকে চাহিয়া, গভীর আশঙ্কায় হতাশভাবে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। সে ভাবিল, বুড়্টা নিশ্চয় গাড়ী ভাঙ্গিবে, আর পথের মাঝে সকলের সাম্‌নে নিরাশ্রয় ভাবে আমাকে দাঁড় করাইবে। কত লোকে হয়ত বিদ্রূপ করিবে ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া উঠিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে গাড়ির দরজা একটু মুক্ত করিয়া পথের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় মিসেস গুপ্তার গাড়িখানি ও তাঁহার গাড়ী পাশাপাশি হইল; তাঁহার গাড়ীর দরজা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি বোধ হয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গাড়ীর দৌড়ে তিনি যে পরাস্ত হইতে চলিয়াছেন, এমন একটা বিমর্ষের ভাব যেন তাঁহার হাস্যোজ্জল মুখের উপর সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যেন তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়া সারাদিনে দুটা কথা বাহির হয় না, লজ্জায় যে সঙ্কুচিত হইয়া

সারাদিন জড়সড় ভাবে অতিবাহিত করে, তাহারই একি ব্যবহার,—পথের মাঝে এমন করিয়া গাড়ী চালাইবার হুকুম দেওয়াই অসহ্য! ইহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সুনীতির অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু বুড়্ঢা যখন তাহার সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ করিল, মিসেস্ গুপ্তর গাড়ীখানিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইল, তখন সুনীতির শুষ্কশীর্ণ মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। তাহার শুষ্ক অধর-ওষ্ঠ মধ্যে যেন অকস্মাৎ শরতের প্রভাতালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই ক্ষীণ হাস্য যেন তাহার নিভৃত অন্তরের প্রচ্ছন্ন বেদনাটীকে মুহূর্ত্তের জন্য আকুল করিয়া তুলিল—এত আদর, এত যত্ন, এত স্নেহ ভালবাসার ভিতর কেমন করিয়া একটা গুপ্ত আঘাত তাহার অন্তরের অত্যন্ত গোপন স্থানে নিজ অধিকার সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহা এ যাবৎ সুনীতি অনুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সুনীতির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যে তাঁর মনোরাজ্যে এমনতর একটা বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহার সন্ধান সে সত্য সত্য রাখিতে পারে নাই; কিন্তু বুড়্ঢা যখন মিসেস গুপ্তর ঘোড়াকে পরাস্ত করিয়া জয়ের উল্লাসে বারংবার হ্রেষারব করিয়া উঠিল, তখন জয়ের মাদকতাও সুনীতির অন্তরকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল—সে সম্পূর্ণ উল্লাসভরে বুড়্ঢার জয়কে আপন অন্তরের মধ্যে আহ্বান করিয়া নিজের অজ্ঞাত বেদনাকে যেন অসীম সান্ত্বনা দান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিল। এরূপ আচরণের উপর সুনীতির কোন হাত ছিল না, বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই তাঁহার উক্ত ঘটনাটি স্মরণ করিতে অত্যন্ত লজ্জা হইল।

মন যে মানুষের এত অবাধ্য—এত দুর্ব্বল—এত সম্মান-ভিখারী তাহা সে এতদিন জানিবার মত বিশেষ অবকাশ পায় নাই—মানুষ যে তুচ্ছ ঘটনাকে এত বড় করিয়া দেখিতে পারে, তাহা সে কখন ভাবে নাই। যাই হক এই ঘটনার পর বুড়্ঢার উপর নিজের

অজ্ঞাতে একটা স্নেহ ধীরে ধীরে সুনীতির মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইল।

[৪]

হরলাল বসুর গলির শেষ সীমায় শৈলেশচন্দ্রের বাড়ী—তারপর আর বাড়ী বা পথ নাই। বাড়ীর পশ্চিম দিকে রন্ধনশালা, রন্ধনশালার পাশ দিয়া খিড়কীর দরজা—খিড়কীর দ্বারের ঠিক পাশেই শৈলেশচন্দ্রের আস্তাবল। অনেক সময় এই গাড়ী-টানা পশুগুলির আহারের তত্ত্বাবধান না করিলে, মনিবের প্রদত্ত দানা, সহিস কোচম্যানের দানাপানির সংস্থান করিয়া পশুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তির দ্রুত আয়োজন করিয়া দেয়। এই কারণে শৈলেশচন্দ্র খিড়কীর দিকেই ইচ্ছা করিয়া আস্তাবল করাইয়াছিল—যাহাতে সময় সময় বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত দেখিতে পারে; কিন্তু সখের জিনিষের আদর-যত্ন তাঁর কাছে—যিনি আদর ও যত্ন করিয়া তাহাদের স্থান দেন। ঘোড়া গাড়ী টানিবে, দানা খাইবে, অসুখ করিলে হাঁসপাতালে যাইবে—নতুবা সহিস কোচম্যানের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাগ্যক্রমে যদি পরমায়ু থাকে, কোন গতিকে বাঁচিয়া পুনরায় গাড়ী টানিবে, এই না তাহাদের সহিত সংসারের সম্বন্ধ? সুতরাং মেয়েদের সেদিকে বড় কাহারও নজর থাকে না, যদি কাহারও থাকে, তবে সে অত্যন্ত দয়াবতী। গৃহপালিত পশুপক্ষীগুলিও যে আমাদের সংসারের দাসদাসীর মত আদর-যত্ন স্নেহ-মমতা পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার দাবী করিতে পারে, তাহা কেহ ভাবে না—মনে করিতে পারে না।

আজ সুনীতি খুব ভোরে উঠিয়াছে—এমন সময় সহিস আসিয়া বলিল, "মায়ি, ঘোড়ার দানা দাও।"

সুনীতি সহিসকে দানা দিয়া বলিল, "আমি বুড্ঢার খাওয়া এখনই দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

সুনীতি সংসারের সকল কাজের মধ্যে এই বাক্‌শক্তিবিহীন গাড়ীটানা ভৃত্যটির আহারের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। এবং প্রতিদিন সে আস্তাবল যাইয়া জননীর স্নেহদৃষ্টিতে তাহার খাওয়া দেখিত। দানা খাইয়া আনন্দে যখন বুড্‌ঢা কাণ দু'টা খাড়া করিয়া টব হইতে মুখ তুলিয়া কৃতজ্ঞভাবে প্রীতি-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সুনীতির মুখের দিকে চাহিত, তখন সুনীতির মাতৃত্ব এই পশুর জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত। বুড্‌ঢাও বেশ বুঝিয়াছিল, সে কেবল আস্তাবলে সহিসের হস্তে তার পশুজীবন সমর্পণ করে নাই।

একদিন সকালে শৈলেশচন্দ্র আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সুনীতিকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া স্বাভাবিক বিদ্রূপসূচক স্বরে বলিল, "এত ভোরে এখানে যে?"

"ঘোড়া পুষলেই হয় না! তাহাদের সুখ, দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা দেখা কি মনে কর কেবল সহিস কোচম্যানের কাজ?"

"তা'মনে করি না বলেই ত তোমার অতিথশালায় তার নাম রেজেষ্টারী করে দিয়েছি। জানি দুবেলা দুটো দানা পাবেই।"

তারপর সহিসের দিকে ফিরিয়া শৈলেশচন্দ্র বলিল, "আট বাজে গাড়ী মাংতা।"

সহিস "জো হুকুম" বলিয়া সেলাম করিল।

সুনীতি ও শৈলেশচন্দ্র উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। পথে সুনীতি বলিল "আজ গাড়ির বিশেষ দরকার আছে কি?"

"কেন বল দেখি?"

"মনে করছিলুম—খোকা ও বুড়ীকে নিয়ে একবার মা'র বাড়ী যাব—অনেক দিন থেকে পূজো তোলা রয়েছে—"

এই সময় খোকা ও বুড়ী নাচিতে নাচিতে সে দিকে ছুটিয়া

আসিল। শৈলেশচন্দ্রকে দুই বাহু দিয়া খোকা জড়াইয়া ধরিয়া, বলিল, "বাবা, আজ আমরা কালীঘাট যাব, ফুলের মালা গলায় দেবো, সন্দেশ খাব," তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া হাতে তালি দিয়া জননীর মুখের দিকে চাহিল। বুড়ীও জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "কখন যাওয়া হবে মা? আমি এখনও কিছু খাইনি। পূজো দেওয়া হলে খাব, কেমন মা?"

শৈলেশচন্দ্র বলিল, "কৈ, এ কথা ত কাল আমায় বল নাই? কিসের পূজা তোলা আছে?"

"নাইবা শুন্‌লে। সব কথাই যে বলতে হবে, তার মানে কি?"

বুড়ী তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, "বাবা, আমি জানি, বলব কি?"

"কি রে?"

সুনীতি একবার ভ্রূকুটী করিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন কিন্তু বুড়ী আনন্দে বলিল, "তুমি ক'লকাতায় বদলী হ'য়েছ কিনা, সেই জন্যে।"

শৈলেশচন্দ্রের মুখখানি গভীর উল্লাসে দীপ্ত হইয়া উঠিল। অন্তরের মধ্যে একটা প্রীতি-মধুর হিল্লোল সঞ্চারিত হইল এবং মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। সে তখন আনন্দবিহ্বল দৃষ্টিতে সুনীতির মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল, "আমার তত বেশী গাড়ীর প্রয়োজন নাই। তোমরা যাইতে পার, কখন ফির্‌বে?"

"বেলা বারটার মধ্যে ফিরে আসব, বাড়ীতে এসে খাওয়া-দাওয়া হবে।"

[৫]

কালীঘাট যাইবার মুখে, থিয়েটার রোডের নিকট বুড্ঢা একখানি ট্রাম গাড়ীর উদ্দাম গতি নিরীক্ষণ করিয়া মহা চটিয়া গেল। সে কি ভাবিল

জানি না। ট্রামের সহিত পাল্লা দিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল ; কিন্তু সুনীতির আজ বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। শত শত মটর ও বড় বড় ঘোড়ার গাড়ী সে পথ দিয়া চলিয়াছে, হয় ত এখনই একটা ধাক্কা কাহার সহিত লাগিয়া যাইবে, আর তখন রক্ষা থাকিবে না। বুড্‌ঢা এত দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল, যে গাড়িখানি দুলিতে লাগিল। আশঙ্কায় সুনীতির সর্ব্বশরীরে নিঃশ্বাস বন্ধ ও রক্তচলাচল যেন স্তব্ধ হইয়া আসিল। সে কি করিবে,ভাবিয়া পাইল না। গাড়ীর দরজা অল্প খুলিয়া দিয়া দেখিল, কোচম্যান প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়ার গতি মন্দ করিতে চেষ্টা করিতেছে। পথের অনেকেই সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষনয়নে গাড়ীর উদ্দাম গতি লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিল। সহিস কেবলই পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,"হুঁসিয়ার হোকে, ভাইয়া হুঁসিয়ার হোকে।" খোকা ও বুড়ী গাড়ীর জানালা ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, এবং যখন গাড়ী ভয়ানক জোরে ছুটিল, তখন তাহারা মহা উল্লাসে নাচিতেছিল। সুনীতি আশু বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া, ভয়াকুল অন্তরে তাহাদিগকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রাণপণশক্তিতে চাপিয়া ধরিল। সে সেদিন লজ্জা-সরমের কথা বিস্মৃত হইয়া ভয়বিজড়িত কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "কোচম্যান, গাড়ি থামাও, গাড়ী থামাও।" কোচম্যান বলিল, "কি করব মা, ঘোড়া কিছুতেই বাঁগ মানচে না।" অনন্যোপায় হইয়া সুনীতি গাড়ীর দরজা সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া বুড্‌ঢার দিকে মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "বুড্‌ঢা, কি হচ্ছে ? সকলকে কি মেরে ফেলবি ?"

স্নেহময়ী জননীর তিরস্কার শ্রবণে দুরন্ত ছেলে যেমন শঙ্কিত হইয়া দাঁড়ায়, সুনীতির কথায় আজ বুড্‌ঢা ঠিক তেমনই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং কি বুঝিয়া জানি না, শান্ত ভাব ধারণ করিয়া ট্রামের নিকট অবনত

মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়া ধীর পাদক্ষেপে চলিতে লাগিল। সেদিন কালীঘাটে মায়ের পূজা সুনীতি প্রাণ ভরিয়া দান করিল।

এ ঘটনা শুনিয়া শৈলেশচন্দ্র বুড়্ঢাকে বিক্রয় করিতে চাহিল; কিন্তু সুনীতি বলিল, "তা হবে না, ও এসে পর্য্যন্ত আমাদের ভাল বই মন্দ হয় নাই।" সুনীতি বুড়্ঢাকে 'পয়মন্ত' বলিয়া বিশেষ যত্ন করিত। বুড়্ঢা, ঘোড়া হইলে কি হইবে, সেও সুনীতিকে বড় শ্রদ্ধা করিত।

[৬]

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি,—অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। কাহার সাধ মধ্যাহ্নে রৌদ্রতপ্ত বাতাস ভেদ করিয়া পথে বাহির হইতে পারে। মেঘহীন আকাশ অচিরে কোন প্রকার নীরদজালে সমাবৃত হইবার বিন্দুমাত্র সূচনা দেখা যাইতেছে না। ছেক্ড়া গাড়ির দুর্ব্বল ঘোড়াগুলি সাজসজ্জা পরিধান করিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে, গাড়ির আড্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া ঢুলিতেছে—দু'একটা দুষ্ট বালক ইস্কুলে না যাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রৌদ্রে তাহাদের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে এই সময় একখনি ঘরের গাড়ি ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশচন্দ্র গাড়ি হইতে লাফ দিয়া নামিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল; বলিল, "বহুত জোরসে হাঁকার।" শ্যামবাজার হইতে পটলডাঙ্গা আসিতে বুড়্টার সর্ব্বশরীর স্বেদসিক্ত হইয়া গিয়াছিল—দুই কস বহিয়া ফেনা নির্গত হইতেছিল; কিন্তু যখন শৈলেশচন্দ্র বলিল, বহুত জোরসে হাকাও তখন বুড়্ঢা কোচম্যানের হুকুমের বা চাবুকের অপেক্ষা না রাখিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

আজকাল বুড়্ঢা বড় ধীর চাল অবলম্বন ককিয়াছিল। সে এখন আর

বড় কাহারও সহিত পাল্লা দিয়া রেষারিষি করিয়া গোঁয়ারের মত দৌড়ায় না; কিন্তু আজ সে তার মনিবের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিল, নিশ্চয় বাড়ীতে এমন একটা কিছু বিপদ ঘটিয়াছে, যাহার জন্য মনিব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দশ :মিনিটের পথ আজ সে পাঁচ মিনিটে আসিয়া হাজির হইল। শৈলেশচন্দ্র ডাক্তারকে লইয়া দ্রুত বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন, তখন সদর বাড়ীতে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া আসিয়া গাড়ীর ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক ভাল। বোধ হয় সন্ধ্যা নাগাদ আরও ভাল দিকে turn নেবে।"
সকলেই উৎগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া ডাক্তারবাবুর কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিল এবং শৈলেশচন্দ্রকে আশ্বাস দিল।

ডাক্তার প্রেস্কৃপসন্ লিখিয়া বলিলেন, "এখনই, ঔষধটা বাথ্গেটের বাড়ী থেকে আনিয়ে দুই ঘণ্টা অন্তর এক দাগ খাওয়াইয়া দিন। শৈলেশচন্দ্র বলিল, "আপনাকে নামাইয়া দিয়া অমনি ঔষধ নিয়ে আসব।"

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর এক খানা ভাড়াটে গাড়ি নিলে হ'তো না? যে রদ্দুর, ঘোড়া পার্বে ত?" বুড্ঢা বোধ হয় এ কথা বুঝিল। উঠিতে না উঠিতে বুড্ঢা প্রাণপন শক্তিতে ছুটিল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারকে পৌছাইয়া বাথগেটের দোকান ঘুরিয়া ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিল। বুড্ঢা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বারংবার উপরের জানালার দিয়ক তাকাইতে লাগিল, ভাবিল এখনই উপর হইতে কেহ যেন সুনীতি ভাল আছে বলিবে।

দশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, খোকার অসুখ করিয়াছে। এখন সে অল্প ভাল আছে। বুড্ঢা এ কয়দিন মানুষের মত সমানে সংসারের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সে যে এতটা ভাবিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে, তাহা কেহই অবগত নয়। সকলেই খোকাকে লইয়া ব্যস্ত।

সকলেই খোকা কিসে শীঘ্র সারিয়া উঠিবে, সেই চিন্তায় নিমগ্ন। ইহা ভিন্ন এটাও সাধারণের পক্ষে ভাবা খুব অস্বাভাবিক যে, বুড়্ঢা আবার মানুষের জন্য দুঃখ করিতে পারে। পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে সহিস দেখিল, বুড়্ঢা থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। তখন সে বুড়্ঢার মুখের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সে মোটেই আহার স্পর্শ করে নাই,—যেমন ঘাস তেমনই রহিয়াছে। সে সহসা কেন যে আহার ত্যাগ করিল, তাহার কারণ সহিস কিছুতেই ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। সহিসকে দেখিয়া বুড়্ঢা মুখ তুলিয়া চাহিল; আজ দুই দিন, কেন যে তাহাকে ডাকা হয় নাই, তাহা ভাবিয়াই যেন সে স্থির হইতে পারে নাই! সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে বিপদের সময়, সে প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিবার অধিকার হইতে অকস্মাৎ বঞ্চিত হইল—তাহার হৃদয় এই সকল চিন্তায় যেন অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল: তাহার নয়ন দিয়া সকলের অজ্ঞাতে অশ্রু বহুবার গড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে আস্তাবলের ভিতর হইতে কতবার মুখ তুলিয়া—উৎকর্ণ হইয়া সুনীতির ঘরের দিকে বেদনাকাতর দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু একটী কথাও শুনিতে পায় নাই—আজ কয়েক দিন সে জানিতে পারে নাই, সুনীতি কেন আর আসে না। যতবার সহিস তার নিকট আসিয়াছে, ততবার তার পশুহৃদয় ব্যথিত হইয়াছে এবং পাগলের মত সহিসের মুখের উপর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন সুনীতি মঙ্গলসংবাদ সন্ধান করিয়াছে। এই কয়েক দিন সহিসও খুব দানা চুরি করিয়াছে—কাজে যথেষ্ট ফাঁকি দিয়াছে এবং বেশ ফূর্ত্তিতে আছে। সুনীতি মোটেই আস্তাবলে আসিতে পারে নাই। দশ দিন ক্রমাগত প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দিনরাত অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া বুড়্ঢা যেন সত্য সত্যই বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রম করিতে, এই কয়েক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সে এমন ভাব প্রকাশ

করে নাই, যাহাতে তাহাকে পরিশ্রান্ত মনে করিবার অবকাশ পাওয়া যায়।

সে দিন খোকা একটু ভাল আছে। সুনীতি জানালার ধারে দাড়াইয়া, আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল মেঘের ভিতর অনন্ত চিন্তার পথ হারাইয়া কূল খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এমন সময় ডাক্তারের বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ী জুতিয়া আনা হইল। অকস্মাৎ সুনীতির দৃষ্টি বুড্‌ঢার উপর পড়িল—দেখিল বুড্‌ঢা যেন আকুল অন্তরে উপরের দিকে অনিমেষ-নয়নে তাকাইয়া আছে। খোকার অসুখ হওয়া পর্য্যন্ত সুনীতি একদিনও বুড্‌ঢার সংবাদ লইতে পারে নাই। হয় ত বেচারীর খাওয়া দাওয়ার সুবিধা হয় নাই। শৈলেশচন্দ্র সেখানে আসিতেই সুনীতি বলিল, "দেখ বুড্‌ঢা বড় রোগা হ'য়ে গেছে।" শৈলেশচন্দ্র উত্তর করিল, "খোকার অসুখের জন্য বেচারী দিন রাত খাট্‌ছে, এমন শান্ত ঘোড়া দেখা যায় না।"

সুনীতি বলিল, "আর ওকে খাটিও না। একখানা ভাড়া গাড়ি আন্‌তে পাঠাও।" তাহাই হইল। বুড্‌ঢা ভাবিল, কেন উহারা আমাকে অমন করিয়া ফিরাইয়া দিতেছে। পরক্ষণে যে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়াছিল, তাহাও সে বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিল। এ ব্যবহার বুড্‌ঢাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল। সেইদিন হইতে নামমাত্র সে দানার টবে মুখ দিত। কোন গতিকে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল।

[৭]

খোকাকে বায়ু-পরিবর্ত্তন করাইতে পশ্চিম লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বুড্‌ঢার যাহাতে বিশেষ যত্ন হয়, সে জন্য বাড়ীর সরকার ও কোচম্যান সহিসকে, যাইবার সময় সুনীতি বারংবার বলিয়া গিয়াছিল। দু'একদিন সরকার আস্তাবলে গিয়া, তারপর কোচম্যানের উপর সকল ভার

দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বুড়্ঢা অনাহারে ও চিন্তায় খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, অনেক সময় সে নিশ্চল হইয়া চিত্রের মত দাড়াইয়া থাকে। সহিস কাছে যাইলে মুখ ফিরাইয়া লয়। দানার বালতি দেখিলে রাগিয়া যায়। সহিস মনে করিল; বুড়্ঢার কোনরূপ অসুখ করিয়াছে। সুতরাং সে, কোচম্যানকে সেকথা জানাইল। কোচম্যান এক দিন নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও একটা টোটকা ঔষধ দিলে শীঘ্র সে সারিয়া যাইবে, এই আশ্বাস দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বুড়্ঢা দেখিল—তাহাকে আর গাড়িতে জোতা হয় না। সুনীতি আর একদিনও তাহাকে তিসি ও ছাতু খাওয়াইতে আসে না। তবে কি সে সুনীতির অসুখের সময় কোন গুরুতর অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? পূর্ব্বে, সে যাহাদের নিকট ছিল, তাহারা প্রথম হইতেই তাহার প্রতি অযত্ন করিত। —তা'র এখানে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহাকে আর বড় একটা গাড়িতে জুতিত না—এবারও কি তবে তার সেই ব্যবস্থা হইয়াছে? শীঘ্র কি এ আস্তাবল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে? মানুষের ব্যবহার, পশুর হৃদয় সেদিন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এক মাস পরে একদিন অত্যন্ত ভোরে বুড়্ঢা দেখিল, কোচম্যান ও সহিস পোষাক পরিধান করিতেছে। সাজ-সজ্জাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস তার সর্ব্বশরীরে একটা অজানা আনন্দের মৃদু স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল। যখন তাহাকে সাজ পরান হইল, তখন তার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। গাড়িতে জুতিয়া যখন তাকে পথে বাহির করা হইল, তখন সবেমাত্র দুই একখানি ঘরের গাড়ী গঙ্গাভিমুখে চলিয়াছে—পুরমহিলাগণ গঙ্গাস্নানান্তে দ্রুতচরণে গৃহাভিমুখে ফিরিয়াছেন। একটী ঘোড়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে দেখিয়াও বুড়্ঢা সেদিন সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিল না, বা

তাহাকে পরাস্ত করিবার কোন উৎসাহ তাহার মধ্যে দৃষ্ট হইল না। পাঞ্জাব মেল আসিবার পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া হাওড়া ষ্টেসনে দাঁড়াইল। বুড্‌ঢা বুঝিতে পারিল না, আজ কাহার জন্য তাহাকে এখানে আনা হইয়াছে। সে প্রথমে মনে মনে ভাবিয়াছিল, হয়ত স্নুনীতি আজ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবেন; কিন্তু বাড়ী হইতে যখন খালি গাড়ি চলিল, তখন সে কতকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিল। তাহার মনে কিছুমাত্র আনন্দ ছিল না।

যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া দাড়াইল। অল্পক্ষণ পরে শৈলেশচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া খোকা ও বুড়ী গাড়ির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পশ্চাতে অবগুণ্ঠন দিয়া স্নুনীতিও ধীরে ধীরে আসিতেছিল। কোচম্যান ও সহিস তাহাদের দেখিয়া সেলাম করিল। স্নুনীতি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সতৃষ্ণনয়নে বুড্‌ঢাকে দেখিতেছিল। এই কি বুড্‌ঢা, সে ত এত রোগা নয়? এত বিশ্রী নয়? এত বুড়া নয়? বুড্‌ঢা বহু দিন পরে স্নুনীতিকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া সম্মুখের তুটি পা তুলিয়া হ্রেসা রব করিয়া উঠিল। স্নুনীতি গাড়ীতে উঠিলে আনন্দে বুড্‌ঢার বক্ষের শীর্ণপঞ্জরগুলি বোধ হয় কাঁপিয়া উঠিল, পশুহৃদয় আজ মানুষের সুখতুঃখ, সমবেদনায় যেন আপনাকে মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ অধীর ও উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল। বুড্‌ঢার নয়ন, স্নুনীতির প্রতি তাকাইতে অভিমান বেদনাভারে আর্দ্র হইয়া আসিল। সে একটী মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। স্নুনীতি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অল্প উচ্চৈস্বরে করুণা-পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "ওগো দেখ, দেখ, বুড্‌ঢা যে আধখানা হয়ে গেছে? বুঝি আর বাঁচবে না"। শৈলেশচন্দ্র ঘোড়ার দিকে চাহিয়া—কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়ার কি হ'য়েছে? তোম লোক সব কুচ দেখতা নেহি!" একথা বুড্‌ঢা বুঝিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু বুড্‌ঢা সেদিন

হাওড়া হইতে পনর মিনিটের মধ্যে শ্যামবাজারে বাড়ী গিয়া উপনীত হইল। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই সুনীতি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বুড়্ঢার ছাতুর বস্তাটা যেন গাড়ির ছাদে দেওয়া হয়।—পশ্চিম হইতে তার জন্য সে উৎকৃষ্ট ছাতু ও তিসি আনিয়াছিল।

বাড়ীর দ্বারে পৌছিয়াই বুড়্ঢা পড়িয়া গেল—সুনীতি গাড়ির মধ্য হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো বুড়্ঢা যে পড়ে গেল।" তাহার চীৎকার শুনিয়া অনেকেই বাহির হইয়া পড়িল। সুনীতি সেদিন কাহাকেও দেখিয়া লজ্জা করিল না—তাড়াতাড়ি বুড়্ঢাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সহিস, কোচম্যান ও শৈলেশচন্দ্র সকলে ধরাধরি করিয়া বুড়্ঢাকে উঠাইলে, দুই তিন বার দাড়াইবার চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। আর উঠিতে পারিল না; কেবল সুনীতি মুখের প্রতি চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল। সুনীতি বলিল, "একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও না? এখনি যে মরে যাবে।"

খোকা বলিল, "বাবা, একখানা গাড়ি করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না?"

সুনীতি অত্যন্ত রাগিয়া বলিল, "না। বুড়্ঢা হাঁসপাতালে যাবে কেন? ওকে আমি বাড়ীতেই ডাক্তার আনিয়ে আরাম করব।" রাশ কাটিয়া দেওয়া হইল। সুনীতি বরফ আনিতে আদেশ করিয়া তাহার মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। আজ বুড়্ঢার পশুজীবন সার্থক বলিয়া মনে হইল। তাহার নয়নের প্রান্ত দিয়া অশ্রুকণা গড়াইয়া পড়িল। সুনীতি তাহার মুখের নিকট বহুদিন পরে সযত্নে ছাতুর চেঙারি ধরিল। মরণের দ্বারে দাড়াইয়াও বুড়্ঢা আজ একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ছাতুর চাঙারিতে মুখ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না, কেবল হতাশনেত্রে চাহিয়া রহিল—তাহার নয়ন অশ্রু-অন্ধ হইয়া গেল।

তাহার মাথা টলিয়া পড়িল, বেচারি আর তাহা তুলিতে পারিল না। তখন বুড্‌ঢার চক্ষের উপর মৃত্যুর নীল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। সে আর একবার সুনীতির স্নেহার্দ্র নয়নের প্রতি শেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিরদিনের মত তাহার অশ্বজীবনের ছুটি ভিক্ষা করিল। এই সময় ডাক্তার আসিলে সুনীতি অবগুণ্ঠ টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার যথারীতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ যে দেখছি দৌড়ের ঘোড়া, একে গাড়ী টানিয়ে মেরে ফেল্লেন ? বাঁচবার কিছু মাত্র আশা নাই—ওষুধ দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা বৃথা !"

শৈলেশচন্দ্র বলিল, "এখন কি করা যায় ?"

"ওকে বৃথা ক্লেশ দেওয়া অপেক্ষা গুলি করে ওর সকল যন্ত্রণার নিঃশেষ করে দেওয়া উচিত।"

সুনীতি অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল।

শৈলেশচন্দ্র সুনীতির ব্যবহার দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়াছিল এবং তাহারও চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দিয়াছিল। সে বলিল, "না ওকে শান্তিতে মরতে দিন? ডাক্তার অল্প বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া প্রাপ্য অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন। সুনীতি খোকার অধিক করিয়া বুড্‌ঢার শুশ্রূষা করিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না।

বিধাতা, মানুষ্য ও পশুর মধ্যে যে স্নেহসূত্রটি বাধিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন করিয়া, বুড্‌ঢা মানুষের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

খোকা

[১]

সেদিন বৈকালে নায়েব গঙ্গাগোবিন্দ যখন আসিয়া জমিদার দক্ষিণা-রঞ্জনবাবুকে মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া দুঃখের সহিত বিনীতভাবে জানাইল যে, তাঁহারই বৈবাহিক লছমনপুরের পত্তনীটী বেনামী করিয়া ডাকিয়া লইয়াছেন, তখন দক্ষিণারঞ্জন ক্রোধে ফুলিয়া তিনটা হইয়া উঠিলেন। কোটরস্থিত নয়নদ্বয় একবার সবিক্রমে বাহির হইবার প্রয়াস পাইল; কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—অধর ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল, এবং মুখ হইতে সুটকার নলটি সরাইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন, "আমার সঙ্গে প্রতারণা! বাল্যকাল হ'তে, আমি তার সৌহৃদ্যের চাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়েছি —তার পুত্রকে কন্যাদান ক'রেছি—এই না আমার অপরাধ?" তারপর নায়েবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এখন যাও, পরে যাহা কর্ত্তব্য আমি তোমায় বলিব।" সট্‌কার নলটি অনেকক্ষণ হাতে করিয়া তিনি কি ভাবিলেন, পরে ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীর হাঙ্গরমুখো নানাবিধ বর্ণালঙ্কৃত ও কারুকার্য্য-খচিত পাল্কীখানি উঠানে আসিল। ঝি ফরসা কাপড় পরিয়া আঁচলে চিঠিখানি বাঁধিয়া লইল। দ্বারবান বহুদিন অব্যবহৃত অনাদৃত পাগড়ীটি একবার ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া মস্তকে পরিয়া, তৈলসিক্ত দীর্ঘ যষ্টিটি কাঁদে করিয়া পাল্কীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণারঞ্জনবাবু ঝিয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ ঝি, বৈবাহিক বল্‌তে এখন লজ্জা করে, সেই নন্দাটার বাড়ী যা, বেলা চারিটার মধ্যে সুধাকে নিয়ে হাজির কর্‌বি।"

ঝি ভয়ে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে একটা আশঙ্কার ছায়া অন্ধকার করিয়া ঘনাইয়া আসিল।

[২]

সুধা আসিয়াছে। এবার যেন কেমন বিষণ্ণ। এবার তাহার স্নেহময়ী জননী অন্যবারের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। নানাঠাকুরের ফল মাদুলির মধ্যে কয়েদ হইল এবং সুধার গলদেশ অলঙ্কৃত করিল। অনেক দেবতা ভবিষ্যতে বিপুল ভোজের আশ্বাস পাইলেন। দু'একটি ছোটখাট পেটুক ঠাকুর হাতে হাতে ফল লাভ করিলেন। সুধা সন্তান-সম্ভবা, একথা গিন্নীর মুখে কর্ত্তা শুনিলেন; ইহাতে তাঁহার যতটা আনন্দ প্রকাশ করা উচিত ছিল, ঠিক ততটা পারিলেন না বুঝা গেল—স্নেহ মায়া স্বার্থের নিকট সেদিন কিছু খর্ব্ব হইয়া গেল।

সুধা আজ প্রায় চারি মাস আসিয়াছে, মধ্যে একবার তাহাকে শ্বশুর-বাড়ী হইতে লইতে আসিয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জনবাবু বলিয়াছিলেন, "মেয়ে পাঠাইব বলিয়া আনি নাই—তাহাকে আর পাঠাইব না।" নন্দবাবু একথা শুনিয়া অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ পুত্রবধূকে আর আনিতে পাঠাইলেন না। দুইটী হৃদয়ে মনোমালিন্যের গভীর অন্ধকার মেঘ জমিয়া উঠিল।

[৩]

একদিন প্রভাতে গিন্নীকে ডাকিয়া দক্ষিণারঞ্জনবাবু বলিলেন, "দেখ, আজকাল আমার শরীরটা বড় ভাল নাই—কাজ-কর্ম্ম বড় ভাল লাগে না, মনের মধ্যে যেন একটা ভয়ানক ওলট্‌পালট্ হ'য়ে গেছে, যেন একটা দারুণ অশান্তি চারিদিক থেকে আমায় ছেয়ে ফেলছে, খালি বাড়ীর মত আমার মনটা বড় খাঁ খাঁ করছে।" এমন সময় ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। পূর্ব্বদিকের বাতায়ন দিয়া নব অরুণ-কিরণ মেজের উপর

পড়িয়াছে। সেই আলোকরশ্মির মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণা নৃত্য করিতেছে। সুধা একমনে তাহাই দেখিতেছিল। তামাক খাইতে খাইতে কর্ত্তা বলিলেন,—"মনে কর্‌ছি দিনকতক পশ্চিম বেড়িয়ে আসব।"

স্নেহময়ী বলিলেন "তা কবে যাবে মনে করেছ?"

কর্ত্তা। কাল দিন ভাল আছে, কালই যাব। কথাটা বলিয়াই তিনি পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "হরেনের চিঠি পেয়েছি, সে আমার জন্য বাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছে।" হরেন সুধার দূর-সম্পর্কীয় মাতুল; মধুপুরের মালগুদামের বড়বাবু।

স্নেহময়ী "কার কার যাওয়া হ'বে?"

কর্ত্তা। "নায়েব মহাশয় থাক্‌বেন, বাকী আর সকলেরই যাওয়া হবে।"

মধুপুরে যাওয়ার কথায় সুধা একটু অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। ধূলিকণাগুলি তাহার চক্ষে সহসা যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার মনে হইল, প্রভাত-অরুণ তার দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া রহিয়াছে। সুধা 'হাঁ', কি 'না' কিছুই উত্তর করিল না, বা কোন প্রকার উল্লাসের ভাবও দেখাইল না। প্রতিবাদ করিবার মত অনেকগুলি কথাই তখন তাহার মনে জাগিয়া উঠিল; কিন্তু পিতা ও জননীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। সে, জানালার ভিতর দিয়া আকাশের শেষ যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর অকারণ দেখিতে লাগিল।

[৪]

মধুপুরে তিনমাস কাটিয়া গেল। সংসারের অনাবশ্যক দ্রব্যের মত কর্ত্তা মধুপুরের সহিত নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না। যখন মহুয়া গাছগুলি অপর্য্যাপ্ত ফল ছড়াইয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত—যখন চা'লের মধ্যে কাঁকরগুলি তাঁহার

দুর্ব্বল দশনকে পরিহাস করিত—আহারের সময় যখন মাছের মধ্যে বালির কণা কির কির করিয়া উঠিত—যখন এক ঘেয়ে দৃশ্য, অসংখ্য গরুর পাল মুক্ত-প্রান্তরের উপর দল পাকাইত এবং ধূপছায়ার মত পাহাড়গুলি তাঁহার চক্ষে বারংবার ধাঁধা লাগাইয়া দিত, কঠিন বেগুনগুলি কিছুতেই তরকারীর মধ্যে নরম হইত না, তখন তিনি দেশে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন; কিন্তু নোঙ্গরবাঁধা নৌকা যেমন আপন ইচ্ছায় নড়িতে পারে না, কেবল স্রোতের মুখে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, দক্ষিণাবাবুও তেমন সুধার মুখের দিকে চাহিয়া নড়িতে পারিলেন না, কেবল চিন্তা-স্রোতে ভাসিতে থাকিলেন। সুধা মাঝে একদিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা, বাবার যখন এ দেশ ভাল লাগ্‌ছে না, তখন দেশে গেলে হয় না?" কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই যেন তাহার লজ্জা হইল, সে আর কোন কথা কহিল না। জননী বলিলেন, "মধুপুর জায়গা ভাল, ওঁর শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে; আর দিন কতক দেখে যাওয়া ভাল।" সুধা বাড়ী যাইবার জন্য চঞ্চল ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ উপর্য্যুপরি সে তাহার স্বামী সুরেশচন্দ্রকে কয়েকখানি পত্র দিয়াছিল; কিন্তু সেখান হইতে একখানিরও উত্তর পায় নাই। সেজন্য তাহার যেমন দুঃখ হইয়াছিল, তেমনই অভিমানও যে হয় নাই তাহাও নয়। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, যাহারা রাগ করে, তাদের কি শুধু রাগ করাই কাজ? তাই হ'বে, কারণ, যারা ভালবাসে তারা ত কখন রাগ করিতে পারে না। সুধা আরও কত কি ভাবিল, কাজটা যে ভাল হইতেছে না, সে তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। বাবা রাগ করিয়াছেন; কিন্তু এ রাগ ত তাহাদের উপর করা হয় নাই, এ রাগের আসামী দেখ্‌ছি আমি। স্বামী ত আমার সকল অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি কি করিলেন? এ কথা মনে আসিতেই সুধার অভিমান হইল, নয়নে

অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; সে তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল—ভয়, পাছে কেহ দেখিতে পায়।

[৫]

মধুপুরে আরও আট মাস কাটিয়া গেল। কর্ত্তার ইচ্ছা থাকিলেও সুধার নিমিত্ত গৃহে ফিরিতে পারিলেন না। মধুপুরেই সুধা জননীর পদে উন্নীত হই। সুধার ছয় মাসের ছোট ছেলেটীর কথা কওয়া অসম্ভব হইলেও—অ্যা—ওঁ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে ও অকা ণ অবিশ্রান্ত হস্ত-পদাদি সঞ্চালন দ্বারা সে দাদা-মহাশয়কে একরূপ আটক করিয়া ফেলিয়াছে। বুড়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন তখনই এই ছোট শিশুটির নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেন, এবং অ্যাঁ ওঁ শব্দের ভিতর হইতে কত কথাই না শুনিতেন। কখনও বলিতেন,—'শিশু তার পিতামহের নিন্দা করিতেছে,—বলিতেছে একটু বড় হই, দেখ্‌ব কেমন ঠাকুরদাদার প্রতিজ্ঞা থাকে, এ বাড়ী এনে তবে ছাড়ব—কি বল দাদামশাই?' এ সব অর্থ শুনিয়া সুধার হাসি আসিত; কিন্তু একটু ভাবিলেই তাহার আঁখিপল্লব অশ্রুভারে আর্দ্র হইয়া উঠিত। সে তখন বাতায়নের দিকে বিষন্নভাবে মুখ ফিরাইত। দক্ষিণাবাবু মনে করিতেন যে, তাঁহার বৈবাহিক নন্দবাবুর অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নতুবা এমন সোণারচাঁদ পৌত্রের মুখদর্শন করিতে পারিলেন না কেন? তাঁহাকে যে কৌশল করিয়া তিনি এই সুখাস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যে খুব জব্দ করিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পাছে কোনরূপে তাঁহার পৌত্রদর্শন ঘটিয়া যায় ভাবিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দক্ষিণাবাবু আরও ছয় মাস মধুপুরে অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। লছমনপুরের পত্তনী বেনামী করিয়া কেনার প্রতিশোধ দিবার এই অভিনব উপায়টি, তাঁহার ঈর্ষাপীড়িত, হিংসাদীপ্ত অন্তরে

যেন সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গৃহভিত্তি-গাত্রে একখানি দর্পণ ঝুলিতেছিল, সহসা তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া তিনি একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যেন মনে মনে বলিলেন,—"কেমন নন্দবাবু লছমনপুরের পত্তনীর খুব আয়, কেমন ?" নন্দবাবু দূরে আপনার সুখশয্যায় নিদ্রিত থাকিলে কি হয় ? দক্ষিণাবাবু স্পষ্টই অনুভব করিলেন, তাঁহার এই তীব্র পরিহাস সকল দিক হইতে তাঁহাকে বৈবাহিক ব্যথিত করিতেছে।

[৬]

বৈশাখ মাস—নির্ম্মল নির্মেঘ আকাশ। ক্বচিৎ দুই একখানি কাল মেঘ আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির নব সাজসজ্জার ভিতর বসন্তের অনুরাগ-রঞ্জন সর্ব্বত্র এখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হেমন্তের জের এখনও মেটে নাই। তবে মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ খুব জাহির হইয়াছে। অনেকেই ইতঃপূর্ব্বে মধুপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আবার অনেকে এখনও আছেন। যাঁহারা এখনও আছেন, তাঁহারা যে শীঘ্র যাইবেন, এমন বোধ হয় না। দক্ষিণারঞ্জনবাবু এখনও মধুপুরেই আছেন, দেশে যাইবার নাম করেন না। সুধা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল, এমন একজন কেহ নাই, যাহাকে দিয়া সে গৃহে ফিরিবার অনুরোধ করিতে পারে। মার কাছে একদিন একথা প্রকাশ করিয়া বলিবে মনে করিয়া সে জননীর নিকট গিয়া উপবেশন করিল। স্নেহময়ী তখন রান্নাঘরে বৈকালের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন। সহসা সুধাকে একাকী সেখানে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শুস্‌নি ? যা, এত রোদ, একটু ঘুমুগে যা।"

সুধা মনে করিয়াছিল, আজ একবার বাড়ী যাইবার কথাটা তুলিবে ; কিন্তু সহসা কোথা হইতে এমন লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া তাহার কণ্ঠ

চাপিয়া ধরিল যে, সেকথা আর সে বলিতে পারিল না? বলিল, "তুমি কি কর্‌চ, তাই দেখ্‌তে এলাম।"

"খোকা কি ঘুমচ্ছে? তাকে কা'র কাছে রেখে এলি?"

সুধা উত্তর করিল,—"ঝির কাছে দিয়ে এসেছি; সে কি সহজে ঘুমতে চায়। তার কাছে অনবরত কথা কইতে হ'বে, তবে বাবুর ঘুম আস্‌বে। ভারি দুষ্ট ছেলে।"

সুধার জননী ময়দার তালটি হাতে করিয়া সস্নেহে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খোকা আজ দুষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু খোকার মাটি ক'বছর আগে যে খুব শান্ত ছিল, তার প্রমাণ বাড়ীসুদ্ধ সকলেই জানে। বের দু'বছর পর পর্য্যন্ত তোমার বায়নার হাত থেকে কারও নিস্তার ছিল না।" অতীত-শৈশবের সহিত পরিচিত হইতে সুধার বেশ আনন্দ হইল; কিন্তু তাহার অভিযানটি আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহার পর আর সে নূতন আব্দার করিতে লজ্জা অনুভব করিল।

জননী বলিলেন, "তুই যদি এসেচিস্, তবে একটা কাজ কর্‌না মা, সিঙা-ড়াতে পূরগুলি দে দেখি, তা হ'লে শিগ্‌গির হ'য়ে যাবে এখন।" সে তখন তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বুকের ভিতর যে কথা বারংবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, তাহা সিঙাড়াতে পূরের মত মনের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়া গেল; প্রকাশ করিবার কোন আশা বা আশ্বাস কোন দিক হইতে সে দেখিতে পাইল না; সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সে নীরব রহিল; কিন্তু মনে মনে স্বামীর উপর তার যথেষ্ট অভিমান হইল। তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি কি কিছু করিতে পারেন না? বাবাব সহিত দেখা করিলে কি তাঁর অপমান হ'বে—যদিই হয়, তা তিনি খোকার মুখ চেয়ে কি সে অপমান সহ্য ক'র্‌তে পারেন না? সুধা স্বামীর ব্যবহার স্মরণ করিয়া অসহিষ্ণু ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এক্‌টা সিঙাড়ার মধ্যে পূর দিতে ভুল হইয়া গেল।

[৭]

দূরে একটা গোলাপের বাগান—সান্ধ্যসমীরণ কুসুম-সৌরভে গৌরব করিয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছিল—প্রকৃতির সকল দিকেই বেশ একটি মৌন-সৌন্দর্য্য উচ্ছলিয়া পড়িতেছিল। সুধার সে সকল দেখিয়া কেবল বিষণ্ণ ও বিমর্ষভাব মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল।

নন্দবাবু দেখিলেন যে, দক্ষিণারঞ্জন বাবু তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবার কোনরূপ আভাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলেন না; বরং দেশে থাকিলে কোন রূপে একটা মধ্যস্থের কথা পাছে উত্থিত হয়, সে নিমিত্ত অকারণ স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিবার অছিলায় কাশী চলিয়া গেলেন। তিন মাসের অধিক হইয়া গেল, তথাপি তিনি দেশে ফিরিলেন না। এদিকে নন্দবাবু পুত্র সুরেশচন্দ্রের পুনরায় বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন,এবং সেকথা বন্যার স্রোতের ন্যায় অচিরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দক্ষিণাবাবুর নায়েব আদেশমত বাবুর কাশী যাওয়াই গ্রামে প্রকাশ রাখিয়াছিল। নন্দবাবুর অভি-প্রায় শুনিবা মাত্র সে তাহার বাবুকে পত্রে সব কথা লিখিল। নায়েবের নিকট হইতে সুরেশের বিবাহের সংবাদ যথাসময়ে ডাকপিয়ন মধুপুরে দিয়া গেল; তখন দক্ষিণারঞ্জন বাবু বেড়াইতে গিয়াছিলেন; সুতরাং পত্রখানি সুধার হাতে পড়িল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানির লেখকের নামটি বাহির হইতে আবিষ্কার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইল; কিন্তু অবশেষে হতাশ হইয়া উঠিলেন। কোথায় এত দিনে বৈবাহিক তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া নরম হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পত্র দিবেন—না এইরূপ ব্যবহার! এক মাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দক্ষিণারঞ্জনবাবু মনে মনে এইরূপ একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন বৈবাহিকের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সেইজন্য নায়েবের পত্রের উত্তরে তখনই লিখিলেন;—"একটা ছাড়া সাতটা বিবাহ দিক্ তাতে আমার

কোন ক্ষতি নাই, আমার কন্যার ভরণপোষণ করিবার মত শক্তি ও সামর্থ্য আমার আছে। তুমি ইহাও বলিও, ইহাতে ভয় পাইবার ছেলে দক্ষিণা-রঞ্জন নয়।" নায়েবের পত্রখানি দীপশিখায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলা হইল। দুইদিন পরে নায়েব, পত্রের উত্তর পাইয়া লোকের নিকট আরও বাড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

স্নেহময়ী দেখিলেন, সেদিন স্বামী অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও অপ্রসন্ন। রাত্রে আহার করিতে বসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে সব খাবার প'ড়ে রইল? কিছুই খেতে পার্‌লে না?"

"আজ শরীরটা বড় ভাল নাই"

"কেন কি হ'য়েছে? ক'দিন থেকেই ব'ল্‌ছ শরীর ভাল নয়—অনেক দিন এক জায়গায় থাকলে, সেখানকার জল হাওয়ায় আর তেমন উপকার হয় না—এখন বোধ হয় বাড়ী ফিরে গেলে ভাল হয়, এখন ত দেশের জল হাওয়া খুব ভাল।"

দক্ষিণারঞ্জনবাবু কোন উত্তর দিলেন না। এ যুক্তিটা খুব স্বাভাবিক হইলেও দেশে যাওয়ায় তাঁহার গুরুতর আপত্তির কারণ ছিল। অদ্য সে কারণ আরও কঠিন ও নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমরা দেশে থাকিব, আর নন্দ আমাদের সাম্‌নে তা'র পুত্রের বিবাহ দিবে, উৎসব ক'র্‌বে, আনন্দ ক'র্‌বে। কিছুতেই তার সে অহঙ্কার সহ্য কর্ত্তে পার্‌ব না। স্নেহময়ী স্বামীকে নীরব দেখিয়া সাহস করিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এমন সময় সুধা আসিয়া বলিল, "বাবা তোমার একখানি চিঠি ছিল—পে'য়েছ?" তিনি খাবারের থালা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"পেয়েছি, তুই এখনও জেগে আছিস্‌?" তাঁহার বুকের ভিতর একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগ এক সঙ্গে যেন বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

[৮]

সেদিন কলিকাতা হইতে দক্ষিণারঞ্জনবাবুর কোন বন্ধু একটি বাজার বাস্কেট্ পাঠাইয়াছিলেন। ভৃত্য যখন ষ্টেশন হইতে সকালে উহা আনিতে গিয়াছিল, তখন দাই খোকাকে গাড়ী দেখাইতে ও বেড়াইতে আনিতে তাহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়াছিল। মধু পুরে অনেক বাঙ্গালী প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ষ্টেশনটি একবার করিয়া ঘুরিয়া যান। এখানে না আসিলে ক্ষুধা হয় না—মন ফস্ ফস্ করে। এটী যেন বৈঠকখানা বাড়ী—অনেকের সঙ্গে এখানে দেখা সাক্ষাৎ হয় ও নিমন্ত্রণ-করণ এবং নিমন্ত্রণ-গ্রহণ উভয় কার্য্যই সমাধা হয়। ভোরের বেলা কেল্-নারে এক পেয়ালা চা যে খাওয়া না হয়, তাহাও নয়। প্রভাতেই প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানি এখানে আসে; সুতরাং অনেকে সমাগত বন্ধুবান্ধবকে অভ্যর্থনা করিতেও আসেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। খাবারওয়ালা, দুধওয়ালা, গরম চা-ওয়ালা গাড়ির দরজায় দরজায় হাঁকিয়া ফিরিতে লাগিল, কেহ মোট তুলিল, কেহ নামাইল, কেহ গাড়ীতে উঠিল, কেহ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

দাই খোকাকে লইয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। চাকর মাল খালাস করিতে গিয়াছে। সেখানে একটী বাবু একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া কাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বোধ হয় কাহারও আসিবার কথা ছিল; তাঁহার আগমন প্রত্যাশায় তিনি ব্যাকুলদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন গাড়ী চলিয়া গেল, একে একে অনেকে ষ্টেসন ত্যাগ করিল, তখন তিনি হুইলারের ষ্টল হইতে একখানি Statesman কিনিয়া যেমন বাসায় ফিরিবার উপক্রম করিবেন, অমনই দায়ের কোলের শিশুটির প্রতি সহসা তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। অনুদ্গতদশন, গোলাপ রক্তাভ কপোল, সুন্দর শিশুটির স্ফটিকস্বচ্ছ নয়ন দুইটি তাহার উপর

পতিত হইলে, শিশু একগাল হাসিয়া উঠিল। এই শিশুর হাসির মধ্যে এমন একটি মোহিনীশক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিল, যাহা বায়ুস্তর স্পর্শ করিয়া ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে এক অজ্ঞাত পুলকপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিল। এই অপরিচিত শিশুটির হাসি ও সৌন্দর্য্যদর্শনে তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শিশুর প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি অনুরাগভরে বলিলেন, "কি গো খোকা! গাড়ী দেখ্‌তে এসেছ?"

খোকা তাঁহার কথা বুঝিল কি না, তাহা শিশুর হাসিকান্নার নিয়ন্তা যিনি, তিনিই বলিতে পারেন। সে কিন্তু প্রত্যুত্তরে আর একবার মধুর হাসির লহর তুলিয়া অনিমেষনয়নে প্রশ্নকারীর মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষুদ্র মৃণাল-ভুজদ্বয় তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

দাই এতক্ষণ এ সব কিছুই লক্ষ্য করে নাই। খোকা তাহার কোল হইতে যখন ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন বাবুটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে খোকাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। যেদিকে চাকর মাল খালাস্ করিতে গিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া বলিল,—"কতক্ষণ গেছে, এখনও মিন্‌সের দেখা নেই,—যেখানে যায়, সেখানেই সে থেকে যায়।" শিশুটি কিন্তু মুখ ফিরাইয়া বাবুটির প্রতি তখনও দেখিতেছিল। বাবুটি বোধ হয় তাহাকে কোলে লইবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু দাসী কি মনে করিবে বা যদি শিশুর আত্মীয়-স্বজন কেহ সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহারাই বা কি ভাবিবেন, এই ভাবিয়া সে কার্য্য হইতে তিনি বিরত হইলেন—ইচ্ছা সত্ত্বেও কোলে লইতে সাহস করিলেন না। সম্মুখে হুইলারের ষ্টল, সেখান হইতে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি একটি লাল গোলা কিনিয়া খোকার হাতে দিয়া বলিলেন—"কাল এস, বিস্কুট কিনে দেব।" তারপর দাই যেমন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার দিকে চাহিল, অমনই তিনি সেখান হইতে অপ্রতিভ হইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে

সুরেশচন্দ্র ভা ন, ছেলেটি অত্যন্ত সুন্দর। যেন আমার সঙ্গে অনেক দিনকার পরিচয় আছে, এমন ভাবটি প্রকাশ করিল। তারপর শিশুর হর্ষোৎফুল্ল টানা টানা চক্ষু ও হাসিভরা গণ্ডদেশ, স্বর্ণদীপ্ত বর্ণপ্রভা সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহার মনের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় স্নেহবন্ধন ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল। এতদিন ত এমন একটি শিশু তাঁহার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া থাকিবার কথা। তাহারও নয়ন হয় ত ইহা অপেক্ষা আরও উজ্জ্বল; আরও বড় বড়, হাসিলে তাহার গণ্ডদেশ হয় ত আরও অধিক টোল খাইয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহসা চারিদিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিলেন ও একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তখন মাথার উপর প্রখর সূর্য্য। ছাতা খুলিবার কথা তাঁহার মনে ছিল না; বাসার নিকটে আসিলে, একজন বলিলেন, "কি মশাই, এত রোদে ছাতা বগলে ক'রে আস্‌চেন যে?" ভদ্রলোক লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিলেন বটে, কিন্তু উত্তর দিলেন না।

আহারাদির পর তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, দাই মাগীর একটুখানিও চক্ষুলজ্জা নাই। শিশুটি বার বার হাত বাড়াইতে লাগিল দেখিয়াও সে জেলখানার কয়েদীর মত তাকে দু'হাত দিয়ে টেনে বুকের মধ্যে আটক ক'র্‌তে লাগ্‌ল,—আমি যেন ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যা'ব, এমন একটা আশঙ্কার ভাব তাহার মুখে ফুটে উঠেছিল কেন? আমি ত কোন কথাই বলি নাই—যদি তার সঙ্গে আজ দেখা হয়, কথাটা পরিষ্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে দোষ কি? বেলা পাঁচটার সময় ভদ্রলোক বেশবিন্যাস করিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ছাতার পরিবর্ত্তে ছড়ি লইয়া চলিলেন। ষ্টেসনে গিয়া যাত্রীদের বসিবার বেঞ্চে বসিলেন—সকালে যে স্থানে ছেলেটির সহিত দেখা হইয়াছিল, সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে কেহ নাই, কেবল একখানা মাল-বোঝাই ঠেলা

গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ীখানি দেখিয়া তিনি মনে মনে অকারণ চটিয়া গেলেন এবং ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া লালবাগ অভিমুখে চলিলেন। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে—সাহেবদের ছেলেগুলা ছুটা-ছুটি করিয়া মাঠে খেলা করিতেছে, স্থানে স্থানে বাঙ্গালীবাবুদের রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছেলে-গুলি ঝি ও চাকরের কোল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বসিয়া বসিয়া খেলা করিতেছে, ক্বচিৎ দুই একটি বালক লাফালাফি করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তির পরিচয় দিতেছে। ঝি ও চাকরগুলি তন্ময় হইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়া সমস্ত চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুইটি বালক পরস্পর বিবাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠে, ততক্ষণ অবধি যেন তাহারা সকল দায়িত্বের অতীত হইয়া আছে। যে দিকে বাঙ্গালীর ছেলেগুলি খেলা করিতেছিল, সেদিকে তিনি ধীরে ধীরে চলিলেন। দাসীদের কোলের ছেলের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অল্প দূর আসিতেই দেখিলেন, সেই দাই ছেলেটিকে কোলে লইয়া লালবাগের দিক হইতে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি স্বাভাবিক গতি লঘু করিয়া আরও মৃদুমন্থর গতিতে চলিলেন। দাই নিকটস্থ হইলে ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া খোকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কিগো, ষ্টেসনে বেড়াতে চলেছ?"

খোকা তখন সকালের প্রাপ্ত লাল গোলাটিকে মুখামৃত সংযোগে সাদা করিতে, প্রাণপণ আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে, এ কথায় মোটেই মনোযোগ করিল না।

দাই সকলের অপেক্ষাকৃত একটু সদয় হইয়া উত্তর করিল, "আমরা কোনদিন ষ্টেসনে যাই না—আজ বাবুর কল্‌কাতা থেকে বাজার এল কি না, তাই গেছেনু—এই সামনের মাঠেই বেড়াতে আসি।"

দাইয়ের কথায় ভরসা পাইয়া তিনি ছেলেটির নিকট আরও অগ্রসর

হইয়া বলিলেন, "তুমি হয়ত ভাব্‌চ, লোকটি কি মিথ্যাবাদী। বিস্কুট দেবার আশ্বাস দিয়া সে কথা আর তুল্‌চে না।"

খোকা অকস্মাৎ তাহার কার্য্যে বাধা পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া শিশু-সুলভ সরল হাস্যে ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিল, এবং দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সহসা তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবার কিন্তু দাই খোকার এরূপ আচরণ বোধ হয় কোন কারণে অন্যায় মনে করিল না, সুতরাং বাধাও দিল না।

বাবুটি খোকাকে আবেগ ও আনন্দভরে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশেষ তৃপ্তি ও অপরিসীম সুখানুভব করিল। ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্পন্দন তিনি যেন সর্ব্বশরীরে অনুভব করিলেন, শিশুর স্পর্শ তাঁহাকে এক অজানা আনন্দের তড়িৎ-আঘাতে বেদনাপীড়িত করিলেও, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আনন্দের উন্মত্ততায় তিনি পুনঃপুনঃ খোকাকে বক্ষে চাপিয়া এবং খোকার বক্ষে মুখ লুকাইয়া তাহাকে বিব্রত ও অধৈর্য্য করিয়া দিল। শিশু অনিমেষনয়নে বারংবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহাকে পরিচিত ভাবিয়া, ক্ষুদ্র করে তাঁহার গোঁফ ধরিয়া টানিল ও হঠাৎ গোঁফ ছাড়িয়া অসংযত হস্তে সুবিন্যস্ত কেশদাম বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথের মাঝে, পরের ছেলে লইয়া এরূপ আচরণটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত ও অশোভন, এমন একটা আশঙ্কা মোটেই তাঁহার মনে হইল না। পথে আসিতে আসিতে অনেক শিশুকে খেলা করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এমন প্রবলভাবে কেহই ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এক একটি ছেলে লোক দেখিলেই হাসিয়া কোলে যাইবার জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে, যেন কতদিনের পরিচিত—কতদিনের দেখা শুনা। অনেক সময় তাহাদের আহ্বানে উত্তর না দিলে, হৃদয়হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়।

দাই লোকটির ব্যবহারে প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মনে মনে ভাবিতেছিল, হয় ত বাবুটি এঁদের আত্মীয় হ'বেন। তা'র পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি খোকার কেউ হ'ন?"

সেকথা বাবুটির কাণে পৌছিল না, তিনি পকেট হইতে দুইখানি বিস্কুট বাহির করিয়া খোকার হাতে দিলেন, খোকা চুল ছাড়িয়া বিস্কুট মুখে পূরিল এবং তৎক্ষণাৎ বিস্কুট মুখ হইতে বাহির করিয়া স্ফটিকস্বচ্ছ হাস্যোজ্জ্বল নয়ন দুইটি তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া যেমনই এক গাল হাসিয়া উঠিল, অমনই তাহার রক্তাভ গণ্ডস্থল টোল খাইয়া গেল। ভদ্র লোক সহস্র চুম্বনে খোকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং দাইয়ের প্রতি চাহিতেই অপ্রতিভ হইয়া তাহার কোলে তাড়াতাড়ি খোকাকে দিয়া কিছু না বলিয়া সম্মুখের পথ ধরিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। অল্পদূর অগ্রসর হইতে না হইতে, খোকা কি করিতেছে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল ভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; কিন্তু, জানি না কেন লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল; পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল আমি ত কিছু অন্যায় কাজ করি নাই, ছোট ছেলে—তাহাকে আদর করিয়াছি মাত্র; ইহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক; তবে কেন অনর্থক এত কুণ্ঠিত হইতেছি? ঝি ত, আমায় কিছু বলে নাই? কেহ ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পথে দাড়াইয়া আমার কার্য্য অবলোকন করে নাই? তবে আমি কেন নিজেকে এমন ভাবে পীড়ন করিতেছি? ভাবিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া পথের মাঝে দাড়াইলেন এবং ফিরিয়া দেখিলেন, তিনি অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি দাই বা খোকা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন অন্যমনস্কভাবে তিনি চলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল—এত দিনে হয়ত তাঁহারও এমন একটী ছেলে হইত এবং তাহাকে লইয়া মধুপুরে

আসিতে পারিতেন এবং পথে দাই তাহাকে এমনই করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইত, কেহ হয়ত ছেলেটর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাকে বিস্কুট, গোলা কিনিয়া দিত এবং সেই সময় আমি সেখানে আসিয়া পড়িতাম, এবং শিশুকে ভালবাসার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতাম। এই সময় তাঁহাদের বাসার মনোহরবাবু বেড়াইয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সুরেশবাবু, আজ এ পথে কোথায় চ'লেছেন ?"

"বেড়াতে বেড়াতে এ দিকে এসে পড়েছি; চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।" কিন্তু সহসা মনে পড়িল, যদি পথে দাই খোকাকে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং তাঁহাকে ডাকিয়া কিছু বলে,--ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া গেল; তিনি হঠাৎ পথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আপনি চলুন, আমি একটি লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।" রাত্রি প্রায় আটটার সময় সেদিন তিনি অন্য পথ ঘুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। সেদিন রাত্রিতে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না। অনর্থক তিনি শিশুর সহিত আলাপ করা লইয়া বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন।

[৯]

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুরেশ ষ্টেশনে চলিল এবং হুইলারের নিকট হইতে একখানি ইঞ্জিন গাড়ী কিনিয়া লালবাগের রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন তখন অদূরের পাহাড়গুলি হইতে প্রভাতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বাতাস আসিয়া সর্ব্বশরীর শীতল করিয়া দিতেছিল। শ্যামল তৃণরাজির উপর শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তার মত ঝলমল করিতেছে। অসমতল ক্ষেত্রের উপরদিয়া মাখন, দুধ, দই লইয়া দুই একজন করিয়া লোক পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুই একজন রেলের বাবুও রাত্রির 'ডিউটি' সারিয়া লণ্ঠনহস্তে

বাসায় ফিরিতেছে। তাহাদের চাপকানের বোতামগুলি প্রায় উন্মুক্ত—মাথায় টুপিগুলি বগলের মধ্যে রক্ষিত। সারা রাত্রি সুরেশের নিদ্রা হয় নাই। নানাপ্রকার স্বপ্নে অনেকবার তাঁহার নিদ্রা ভগ্ন হইয়াছিল। মাঠের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিলেন। মনে ভাবিলেন, এতক্ষণ দাই নিশ্চয় খোকাকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। তখন কিন্তু সে মাঠে কেহই আসে নাই। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, বোধ হয় কল্যকার ঘটনা বাড়ী গিয়া সে বলিয়াছে ; সেই নিমিত্ত হয় ত খোকার মা-বাপ রাগ করিয়া মাঠে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তাই কি সত্য ? এই সময় দূর প্রান্তর হইতে একটা দমকা বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া মহুয়া গাছের শাখাপল্লব বিকম্পিত করিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ চমকিয়া উঠিলেন, এবং এরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয় মনে করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। মনে করিলেন, আজ দাইয়ের সঙ্গে দেখা হইলে, অগ্রে তাহার বাবুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং তিনি কোন্ বাড়ীতে থাকেন, তাহাও জানিয়া লইবেন। অল্পদূর যাইতেই দেখিলেন—মহিলাগণ প্রভাতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। সুরেশ মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হইয়া পথ ছাড়িয়া রাস্তার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে দাই খোকাকে কোলে করিয়া চলিয়াছে কি না, দেখিতে তাঁহার সাহস হইল না। এত ভোরে পথে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একবার যেন সুরেশের মনে হইল, প্রভাতের বায়ুস্তর কম্পিত করিয়া একটি শিশু হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির ধ্বনি যেন খোকার হাসির মত মিষ্ট ; কিন্তু ফিরিয়া দেখিতে তাঁহার আশঙ্কা হইল। পাছে কোন রমণী তাঁহার সে দৃষ্টি দেখিয়া অপ্রতিভ হ'ন। প্রাণহীন কলের পুতুলের মত তিনি সোজা পথেই চলিতেছিলেন। সে চলার মধ্যে কোনপ্রকার আনন্দ, উৎসাহ বা অগ্রহ মোটেই দেখা যাইতে-

ছিল না। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, এতক্ষণ বোধ হয় খোকা মাঠে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে চারিদিক্ চাহিতেছে; হয় ত তাঁহাকে না দেখিয়া সে কাঁদিতেছে। কান্নার কল্পনা মনে আসিতেই খোকার স্ফটিকস্বচ্ছ নয়ন দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—তখন তাঁহার নয়ন পল্লব অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তিনি সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, দলে দলে রমণীগণ সেদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; সুতরাং তাঁহার ফেরা হইল না। তিনি দূরে একটি বৃক্ষমূলে কিয়ৎক্ষণ হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন - পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাসার দিকে ফিরিলেন। তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। অনেকে বেড়াইয়া ফিরিতেছে। বালক-বালিকাগণ গৃহপ্রাঙ্গণে খেলা করিতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, দাই নিশ্চয় আসিয়া এতক্ষণ ফিরিয়া গিয়াছে। ইঞ্জিন গাড়িখানি বারংবার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এখানি পাইলে খোকা কত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া হাসিত, আনন্দে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি একখানি গোলাপফুলের বাগানওয়ালা বাঙ্গ্‌লার উপর পড়িল। দেখিলেন, সেই বাঙ্গ্‌লার ভিতর হইতে তখন দাই খোকাকে লইয়া আসিতেছে। খোকার হাতে একটি ক্ষুদ্র গোলাপফুলের তোড়া। লাল ফুলের দিকে খোকার মন অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দুই একটি কুসুম, তাহার কুসুম কোমল হস্তের স্পর্শে আনন্দে অতনু হইয়াছে—বাকিগুলিকে সে উদরসাৎ করিবার চেষ্টায় বিব্রত। বাঙ্গ্‌লার খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া সুরেশ বলিল "কি গো খোকাবাবু ফুল খাচ্চ? সে কথায় খোকা ভ্রূক্ষেপ করিল না। লাল ফুলের রঙে তখন সে বিভোর। সুরেশ দাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এত রোদে খোকাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"এই ত আমরা বেড়িয়ে আস্‌চি। হ্যাঁ বাবু, আপনার নাম কি?"

কি জানি কেন এই সামান্য প্রশ্নে সেদিন সুরেশের মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা দাই আজ একথা জিজ্ঞাসা করিল কেন ভাবিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা ক'রেচেন ; তাই বল্‌চি।"

সুরেশ সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পকেট হইতে ইঞ্জিন গাড়ীখানি বাহির করিয়া খোকার সম্মুখে ধরিলেন। খোকা তখন নূতন জিনিষ পাইয়া ফুলের তোড়া ফেলিরা গাড়ী লইয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিল ও নূতন বন্ধুর কোলে গেল। খোকা সুরেশের মুখের প্রতি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কি যেন দেখিল। তা'র পর তাহার টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি হাসির জোয়ারে ভরিয়া উঠিল। সুরেশ আবেগভরে তাহাকে চুম্বন করিল। খোকা তখন গাড়ীখানিকে উদরসাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দাইয়ের দিকে ফিরিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবুর নাম কি ? তোমরা কি এই সুমুখের বাড়ীতে থাক না ?"

"আমরা আরও আগের বাড়ীতে থাকি। ওমা, অঞ্জনবাবুকে আপনি চেনেন না !"

"না।"

দাইকে পুনরায় প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি খোকাকে দাইয়ের কোলে দিয়া বলিলেন, "বেলা হ'য়ে গিয়েছে, খোকাকে বাড়ী নিয়ে যাও।" তা'রপর ক্ষিপ্রচরণে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দাই আজ তাহার এরূপ আচরণে আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

[১০]

এমন করিয়া আর এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণারঞ্জনবাবু বলিলেন, "দেখ গিন্নি, লোকটি সম্বন্ধে তুমি যে ব'লেছিলে, সে আমা-

দের হয়ত চেনা, কিন্তু তা নয়; আমার মনে হয়, এমন একটী ছেলে বোধ হয় তা'র ছিল—"

"ওগো, চেনাই যেন হয়" বলিতেই স্নেহময়ীর চোখে জল আসিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "খুব সন্দেহ হয়, লোকটি পরিচিত নয়, নইলে এত দিন দেখা করে নাই কেন?" খোকাকে ভালবাসে, এটা এমন কিছু গর্হিত কাজ নয়?

"তিনি যিনিই হউন, খোকাকে বড় ভালবাসেন। সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই, ভগবান্ না করুন, তাঁর বোধ হয় খোকার মত—"

স্নেহময়ী আর বলিতে পারিল না। দক্ষিণারঞ্জন বাবু কথাটি পাল্টাইয়া বলিলেন, "দাই মাগীর একটু ত বুদ্ধি নেই, নইলে তাঁর নাম কি, কোথায় থাকেন, জেনে আস্‌তে পার্‌লে না? এক দিন তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে।"

এই সময় সুধা খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "বাবা, দেখুন খোকা ডাকাত হ'য়েছে, আজ আবার কা'র মটর-গাড়ী নিয়ে এসেচে।"

খোকা দাদা মহাশয়ের কোলে উঠিয়া বৃদ্ধের মুখের উপর সোহাগভরে মটর-গাড়ীখানি চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ওরে শালা, আমার মুখখানা কি বড় রাস্তা পেলি নাকি যে, অবাধে গাড়ি চালিয়ে দিলি?"

স্নেহময়ী বলিলেন, "খোকা মনে ভাবে, দুনিয়ার সকল জিনিষই খেতে হয়, তাই মটর-গাড়ীখানা আমোদ ক'রে খেতে দিচ্চে, তোমাকে বেশী ভালবাসে কি না?"

খোকা যখন দেখিল যে, দাদামশাই বা কেহ, মোটেই গাড়ীখানি খাইয়া হজম করিবার উৎসাহ প্রকাশ করিল না, তখন সে নিজের মুখে প্রবেশ

করাইতে সযত্ন হইল এবং সকলকেই উপহাস করিয়া হাসিয়া যেন বলিতে লাগিল, "এমন রসস্বাদহীন খাদ্য সরস করিয়া খাওয়া তোমাদের অদৃষ্টে থাকিলে ত খাইবে ?"

স্নেহময়ী বলিলেন, "দাই বলিয়াছিল যে, তিনি প্রতিদিন এদিকে বেড়াতে আসেন। তুমি যখন বেড়াতে যাও, সে সময় দেখা কর্‌লে ত ভাল হয়। কাল সকালে দাই যখন খোকাকে নিয়ে যাবে, তখন আমায় বলিস্ ত সুধা।"

বেলা অনেক হইয়া গিয়াছিল দেখিয়া, স্নেহময়ী বাললেন, "নেয়ে টেয়ে নাওগে যাও।" কর্ত্তা প্রাণ ভরিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "এই যাই।"

[১১]

এই সুযোগে খোকা বাঘের মত ছুটিয়া আসিয়া থাবা দিয়া তেলের বাটিটী উল্টাইয়া দিল ও কতকটা তেল নিজের মাথায় চাপড়াইতে লাগিল। "দুরন্ত পাজি" বলিয়া সুধা তাহাকে এক ধমক দিল ও কোলে তুলিয়া লইল। খোকা কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া এক গাল হাসিয়া, জননীর বক্ষে মুখ লুকাইল। দক্ষিণারঞ্জনবাবু ও স্নেহময়ী আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

মধ্যে চা'র পাঁচ দিন বেড়াইতে গিয়া সুরেশ খোকাকে দেখিতে পায় নাই ; দাই তাহাকে আর বেড়াইতে লইয়া আসে না। কেন এমন হইল, ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আজ তিনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন দেহে যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখ সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হইয়া তাম্রবর্ণ হইয়াছে—মাথার চুলগুলি রুক্ষ হইয়া আছে, তাহার উপর অজস্র ধূলিকণা জমিয়া পাকা চুলের

মত দেখাইতেছিল। মুখ চিন্তাভারক্লিষ্ট, মনে যেন কিছুমাত্র সুখ নাই, একটা অবসাদ ও নৈরাশ্যের ভাব যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—বড়ই অন্যমনস্ক। বামুনঠাকুর অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া এইমাত্র আহার করিয়া, তাঁহার ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিতেছিল, এমন সময় তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, "কি বাবু, চান ক'র্‌বেন, না একবারে খেতে ব'স্‌বেন?"

সুরেশ টক্ টক্ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নয়, তুমি খাও, আমি খাব না।"

ঠাকুর দেখিতেছিল, আজ চা'র পাঁচ দিন বাবুর আহারে বড় রুচি নাই। ভাবিল, একটা কিছু হ'য়েছে। বোধ হয়, বাড়ী থেকে কোন মন্দ সংবাদ এসে থাক্‌বে। জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।

সুরেশ ঘরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া একবারে শুইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ অবধি তিনি চক্ষু মুদিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"তাঁহার নিজের ছেলে নাই। পরের ছেলের জন্য তাঁহার এতটা উদ্বেগ কেন? খোকার সহিত কয়েকদিন মাত্র দেখাশুনা, কিন্তু তাহাকে না দেখিলে, তাহার জন্য অকারণ কেন এত উৎকণ্ঠা আসিয়া জোটে? একদিন দেখা হইয়াছিল, বেশ। তারপর যদি তাহার সহিত এত ঘনিষ্ঠতা না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এত চিন্তা হইত না। তাঁহার মনে হইল, অঞ্জনবিলাসবাবু, বোধ হয় দাইয়ের নিকট সব কথা শুনিয়া আর খোকাকে বাহিরে আসিতে দেন না—তাই কি? তাহাদের সহিত আমার পরিচয় নাই—এই না দোষ? তা আলাপ করিলেই ত সব চুকিয়া যাইবে। আলাপ না করিয়া খোকাকে খেলনা কিনিয়া দিয়া তিনি যেন একটা গুরুতর অপরাধ ও অন্যায় করিয়াছেন, এই ভাবই যেন বিস্ময়বিমুগ্ধ দাইয়ের সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন সেই

গোলাপবাগানওয়ালা বাড়ীখানির পর পর পাঁচখানি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কতবার তিনি আনাগোনা করিয়াছিলেন—কতবার দাইয়ের কোলে খোকাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলভাবে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও ত দেখিতে পান নাই! ভাবিলেন, তবে কি তাহারা চলিয়া গিয়াছে? মনে করিলেন—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু তাঁহার মনে হইল, পাশের বাড়ীর একটী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যেন সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন. তাই তিনি সাহস করিলেন না, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।"

এরূপ কত কথাই তাহার মনে উদয় হইতেছিল। এমন সময় চাকর সেখানে আসিয়া তাঁহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সকালে চা খান নাই?" সুরেশের চমক ভাঙ্গিয়া গেল—উঠিয়া বসিয়া দেওয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। বলিলেন "চা-টা একটু গরম ক'রে আন্‌তে পারিস্?" "আন্‌চি" বলিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া চাকর চা গরম করিতে গেল। সুরেশ উঠিয়া গিয়া টেবিলের ধারে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। টেবিলের উপর বিস্কুট ছিল, খাইতে গিয়া একখানি পত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পত্রখানি, সেদিন তাঁহার বাড়ী হইতে আসিয়াছিল; সুরেশ তাহা দেখেন নাই। পত্রে তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন,—"বিবাহের সব ঠিক হইয়াছে; তোমার শরীর যদি সারিয়া থাকে, তবে শীঘ্র চলিয়া আসিবে।"

সুরেশ গম্ভীর হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিলেন। তা'রপর পোর্টমেণ্ট খুলিয়া সুধার তিন চার খানি পত্র বাহির করিয়া, যেখান হইতে চিঠিগুলি আসিয়াছিল, সেই ডাকঘরের মোহরটি বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু সেখানকার কোন মোহর খামের উপর তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। গাড়ীতেই বোধ হয় চিঠি পোষ্ট করা হইয়াছিল। তিনি

হতাশভাবে পুনরায় পত্রগুলি পোর্টমেণ্টে বন্ধ করিলেন। রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নের তপ্ত বাতাস দূর প্রান্তর হইতে আসিয়া অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বেদনার মত বাতায়নমুখে প্রবেশ করিয়া আকুলকণ্ঠে যেন কক্ষের মধ্যে হা হা করিয়া উঠিল। বাবুকে চিন্তাকুল দেখিয়া চাকর নিঃশব্দে চা রাখিয়া চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র বিবাহের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসুস্থতার ভান করিয়া মধুপুরে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মনে করিয়াছিলেন, পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিলে, জিদের ভাবটা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। যাহা হউক, চা খাইয়া সুরেশ একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। সে দিন, বৈকালে তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন না। রাত্রিতেও তাঁহার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা আসিল না। ভাবিলেন, খোকার কোনরূপ অসুক করে নাই ত? তাঁহার চক্ষের সম্মুখে খোকার রোগকাতর, শীর্ণ, শুষ্ক ম্লান, মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরের মধ্যে খোকার মঙ্গলের নিমিত্ত একটি অনাবিল বেদন-কাতর স্নেহ-করুণ নিবেদন ভগবানের চরণে বারংবার—অনুগ্রহ ও করুণাভিক্ষা করিয়া ফিরিল। তখন পূর্ব্বদিকের মুক্ত বাতায়নপথে কর্পূর-ধবল রজতরশ্মি আসিয়া গৃহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জানালা দিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পরিপূর্ণ গৌরবে শশধর অজস্র কৌমুদীধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কোনখানে যেন এতটুকু অন্ধকার নাই! জোৎস্না-বন্যায় আজ সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। কেবল তাঁহারই মনের মধ্যে গভীর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া ঘনাইয়া উঠিতেছে। সেখানে আলোকরেখাপাতের কণামাত্র সম্ভাবনা সুরেশ দেখিতে পাইলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, যেন বিশ্ববিমোহন চন্দ্রকিরণ-বন্যায় একখানি ক্ষুদ্র তরণী, সীমাহীন অনন্তপথে নৈরাশ্যের পাল তুলিয়া যাত্রা করিয়াছে। তরণীর উপর সুধা—আর সুধার কণ্ঠ-

বেষ্টন করিয়া খোকা হাসিতেছে। ভাবিলেন, ছি! ছি! এরূপ কল্পনা কেন তাঁহার মনে আসিল? তিনি ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নানারূপ চিন্তায় অধৈর্য্য হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। গভীর রজনীর সুশীতল সমীরণ-স্পর্শে অচিরে সুরেশচন্দ্র নিদ্রামগ্ন হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া স্থির করিলেন,—অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, এখানে আর থাকিবেন না। আজ শেষ একবার লালবাগের দিকে চলিলেন। যদি খোকার অসুখ হইয়া থাকে, তবে হয় ত এতদিনে সে সারিয়াছে এবং বেড়াইতে আসিয়াছে। পকেটে হাত দিয়া সেদিনকার সেই শুষ্ক গোলাপ-ফুলের তোড়াটি বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া তাহা পুনরায় যথাস্থানে মহামূল্য রত্নের মত লুকাইয়া রাখিলেন। মধ্যাহ্নে তপ্ত বায়ুর স্তর ভেদ করিয়া যখন অন্যমনস্কভাবে সুরেশ লালবাগের পথ দিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন, তখন পথ জনমানব-হীন। মাঝে মাঝে দুই একটী রাখাল-বালক মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া মহানন্দে গান ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছে। সুরেশের কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল—সহসা একখানি বাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; গৃহস্বামীর অনুসন্ধান করিয়াও কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে করিয়াছিলেন, যদি কেহ বলিতে পারে—অঞ্জনবিলাস বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন এবং তাঁহারা আছেন কি না। এই সময় দেখিলেন, কিছু দূরে একজন ভদ্রলোক ও তাহার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক একটী ছেলেকে কোলে লইয়া সেদিকে আসিতেছে।

সুরেশ ভাবিলেন, দাই নয় ত?—ছেলেটী ত ঠিক খোকারই মত। বাবুটির মাথায় ছাতা ছিল না, একখানি চাদর জড়ান। স্ত্রীলোকটী ছেলের মাথায় ছাতা ধরিয়া আসিতেছিল। সুরেশ মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে নীরব হইয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হইল, যেন তাঁহার

তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। সুরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু মুখের উপর খানিকটা চাদর আসিয়া পড়ায়, ভাল দেখিতে পাইলেন না, তথাপি তাঁহার আশঙ্কা হইল। তিনি দাই ও খোকাকে বেশ চিনিতে পারিলেন। ভাবিলেন, ঠিক হইয়াছে, এতদিন পরে বোধ হয় ভদ্রলোক অনুসন্ধান করিতে তাঁহার বাসায় গিয়া থাকিবেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন ধারা ভদ্রলোক আপনি মশাই, জানা নাই, শোনা নাই, লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি আমার ছেলের হাতে খাবার দেন, খেলনা কিনে দেন—এ কোন দেশী আদর?" সুরেশ পথ হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এইরূপ করাতে যে কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই—এরূপ চিন্তা তখন তাঁহার মাথায় আদৌ স্থান পাইল না। লজ্জা ও অপমানের আশঙ্কায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষে ভাল দেখিতে পাইলেন না, মাথা ঘুরিয়া গেল, পড়িয়া যাইতে যাইতে একটা গাছ ধরিয়া সাম্‌লাইয়া লইলেন। তিনি আর কিছুই ভাবিতে পারিলেন না। এমন সময় বৃদ্ধ নিকটে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—"বাবাজি, তুমি এখানে কোত্থেকে?"

পরিচিত কণ্ঠের স্নেহের আহ্বানে সুরেশ ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন, —দেখিলেন তাঁহার শ্বশুর দক্ষিণারঞ্জনবাবু। সুরেশ কোন কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শ্বশুর আনন্দভরে তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া মস্তকে হাত দিয়া স্নেহ-বিহ্বল অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বড় রোদ; বাবাজি, তোমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গিয়েছে, চল বাসায় যাই। এই সাম্‌নের বাড়ীতেই আমি থাকি। একজন ভদ্রলোক, খোকাকে অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন, তাই তাঁকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে গিয়াছিলাম; বাড়ী জানা ছিল না, অনেক ঘুর্‌তে

হ'য়েছে। সেজন্য বড় দেরী হ'য়ে গেছে। লোকটি সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে ; এতক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিলাম, দেখা হ'ল না। চিঠি লিখে চ'লে এলাম। চল, চল,—দেরী ক'রে কাজ নাই।" দাই ব্যাপার দেখিয়া ত হতবুদ্ধি! সে বিস্ময়-বিমুগ্ধদৃষ্টিতে সুরেশবাবুর দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কর্ত্তা বাড়ীর ভিতরে আসিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গিন্নি, গিন্নি, সুরেশ এসেছে।"

খোকা দাইয়ের কোল হইতে তাহার পরিচিত বন্ধুটির কোলে আনন্দে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই দৃশ্য দেখিয়া পাশের ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দরী যুবতী কেবলই আনন্দাশ্রু মুছিতেছিল। ক্ষুদ্র শিশু আজ তা'র দাদামশাই ও সুরেশের মধ্যে থাকিয়া যে প্রীতিপূর্ণ মধ্যস্থতা করিয়াছিল, তাহা কেবল যে দুইটি সংসারের মনোমালিন্য বিদূরিত করিয়াছিল, তাহা নয় ; একটা নিবিড় সন্ধিবন্ধনে উভয় সংসারকে চিরদিনের জন্য এক করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রত্যুপকার।

[১]

সে বৎসর সহরাঞ্চলে ব্যায়রামের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। অনেকেই বহুকাল পরে জীর্ণ পল্লীভবনখানি পরিস্কার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবজ্ঞা ও অবহেলায় যাহা এতদিন অপ্রিয় ও অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, এখন তাহাই সুখ ও স্বাস্থ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে কাল কেবল একবার অলক্ষ্যে হাসিয়াছিল। ম্যালেরিয়া-অভিশপ্ত পল্লীগ্রামগুলি সে বৎসর অনেক সহরবাসীর জীবনরক্ষা করিয়াছিল।

আশৈশব পল্লীগ্রামে পরিবর্দ্ধিত নিশিকান্ত কলিকাতায় ডাক্তারী করে, এবং পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভাব ও অভিযোগের কথা উত্থাপিত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে, সকলের কলিকাতায় বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য, এরূপ একটী অভিমত প্রকাশে তাহার ডাক্তারী ব্যবসায়কে আরও জাঁকাইয়া লয়। এই সকল কারণে নিশিকান্তের একটু পসার প্রতিপত্তি হইয়াছে।

মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া সে মানুষ হইয়াছে। মাতুল হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা উমা ভিন্ন আর কোন পুত্রাদি ছিল না। সুতরাং ভাগিনেয় নিশিকান্তের উপর তাঁহার সকল স্নেহ ও যত্ন পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। তিনি নিশিকান্তকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাহার লেখাপড়ার নিমিত্ত বৃদ্ধ হরিনাথ তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন এক ব্যবসায় করিতে গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। এরূপ

অবস্থায় একদিন সূর্য্যমুখী হাসিয়া স্বামীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমাদের আর ভাবনা কিসের? নিশি এখন মানুষ হ'য়ে উঠেছে। দু'পয়সা আন্‌তে শিখেছে। এখন আমরা পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাক্‌বো।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া হরিনাথবাবু মৃদু-হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু নিশি সবে নূতন ডাক্তার, ওর নিজেরই এখন অনেক খরচপত্র আছে। কলিকাতা সহরে পসার করা বড় শক্ত ব্যাপার। গাড়ীঘোড়া, সাজসজ্জা করতেই অনেক টাকা খরচ।"

সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন "তা ব'লে কি আমরা উপোস ক'রে থাক্‌ব, আর নিশি গাড়ী চ'ড়ে বেড়াবে, ব'লতে চাও?

"তা বল্‌চি না অবশ্য,—আমাদের কষ্ট কোন দিনই সে দেখতে পারবে, এমনটা আমার মনে হয় না। তারপর ভগবান জানেন, তার মনে কি আছে! প্রথমটা নিশির কিছু খরচ আছে কি না, সে জন্য একটু ভাবনার কথা।"

বৃক্ষ রোপণ করিয়া অনেকেই দূর ভবিষ্যতের প্রথম ফলটি কিরূপ হইবে এবং তাহা কাহাকে প্রথম প্রদান করা হইবে, মনে মনে সে বিষয়ের যেমন একটা অভিনব ও অনুকূল সমালোচনা করিয়া সুখী হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশিকান্তের ডাক্তারীর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল অব-লোকন করিয়া হরিনাথ ও সূর্য্যমুখী মনে মনে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। সূর্য্যমুখী তখন স্বামীর নিকট প্রকাশ না করিলেও, তিনি যে শীঘ্রই মুখোপাধ্যায় পরিবারের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া, চারখানা ঢোল আনাইয়া, দুই দিন যাত্রা দিয়া দুর্গাপূজা করিবেন, এমন একটা সুখ-স্বপ্ন স্বর্ণমৃগের মত তাহার চিত্তব্যাধকে যে বারংবার প্রতারিত না করিল এমন নয়। সমুদ্রের সুনীল নির্ম্মল বারিরাশি কেবল তৃষ্ণার

বৃদ্ধি করে, তৃপ্ত করে না। সূর্য্যমুখী ও হরিনাথের আশামরীচিকা দিন দিন নিশিকান্তের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিবিড়ভাবে প্রবল হতাশ্বাসের মধ্যে অনবরত অসংযত বেগে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু তাঁহাদের অদৃষ্টে এক নিমেষের জন্য বিশ্রাম বা বিরাম উপভোগ করিবার মত এমন কিছুই ঘটিল না।

[২]

নিশিকান্তের বিবাহের পর হইতে, তাহার বড়লোক শ্বশুর এই ডাক্তার জামাতাটির সুখদুঃখের ভার অচিরে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন ও অযাচিতভাবে নিশিকান্তের উপর অজস্র অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অনুগ্রহলাভে নিশিকান্তও নিজেকে যথেষ্ট সম্মানিত বলিয়া যে অনুভব না করিল এমন আভাস তাহার আচরণ হইতে মোটেই প্রকাশ পাইল না। শ্বশুর, জামাতাকে এ কথাও বলিলেন "ঘন ঘন পল্লীগ্রামে মাতুলকে দেখিতে যাইলে, তাহার ব্যবসার একদিকে যেমন ক্ষতি, অপর দিকে পচা পুষ্করিণীর জল খাইয়া স্বাস্থ্যহানিরও বিশেষ সম্ভাবনা।" সহধর্ম্মিণী জীবনসঙ্গিনী নলিনীবালা স্বামীকে অবসরমত পিতার সদুপদেশের গুরুত্ব বর্ণে বর্ণে বুঝাইয়া দিল। গুরুজনের বাক্যে অবহেলা করা মহাপাপ এমন একটা ধারণা নিশিকান্তেরও মনের মধ্যে শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। সুতরাং ম্যালেরিয়া বীজাণু পরিপূর্ণ বায়ু সেবন করিয়া বৃদ্ধ মাতুলকে দেখিতে যাওয়া অচিরে ঢিলা পড়িয়া আসিল।

হরিনাথবাবু দেখিলেন—নিশিকান্ত আর পূর্ব্বের মত প্রতি সপ্তাহে আসিতে পারে না। দুই তিন সপ্তাহ অন্তর, একবার আসে এবং আসিয়াও দুই তিন ঘণ্টার অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, "বলে

হাতে অনেকগুলি রোগী আছে।” নিশি এত অল্প দিনের ভিতর গণ্যমান্য, বিশিষ্ট ও বড়দরের ডাক্তার হইয়া পড়িয়াছে, ভাবিতে তাঁহার লোলচর্ম্ম গণ্ডস্থলের শীর্ণ শিথিল শিরাগুলি পর্য্যন্ত উল্লাসে আনন্দোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। নিশির ভাবান্তর অবলোকন করিয়া পাছে সূর্য্যমুখী কিছু মনে করেন, তাই তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলেন, “আমাদের নিশির এখন একরত্তি সময় নেই। তার হাতে এখন অনেকের জীবন নির্ভর কর্‌চে, তাকে অনর্থক থাকৃতে অনুরোধ করো না।”

আজকাল নিশি মাতুলকে দেখিতে আসিয়া প্রথমেই তাহার কাজের কথা পাড়িত। বলিত, “সে, সময় মত আহার করিবারও সময় পায় না। কোন দিন তিনটার পূর্ব্বে খাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।” পৃথিবীর সমস্ত অসুবিধাগুলি যেন নিশিকে ঘিরিয়া আছে। প্রথম প্রথম নিশিকান্ত মাতুলের নিকট এরূপ প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা ও আশঙ্কা বোধ করিত। সময়ে আহার হয় না শুনিয়া হরিনাথ ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন ও যাহাতে যথাসময়ে খাওয়া হয় সেজন্য পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। মাতুলকে প্রবঞ্চনা করা যে অন্যায় এমন একটা চিন্তা মাঝে মাঝে নিশির মনের মধ্যে উঁকি মারিত, কিন্তু যুক্তি ও তর্ক সন্ধি করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিত যে, মাতুল তাহার এমন কিছু করেন নাই, যাহার নিমিত্ত তাহার মূল্যবান সময় অপব্যয় করিয়া তাহাকে মাসে দুইবার করিয়া দেখিতে আসিতে হইবে। তুলনায় সমালোচনা করিয়া সে দেখিল যে, প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শ্বশুরই তাহার উন্নতির একমাত্র কারণ; যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সঙ্গত ও শোভন হয় তবে তাহা শ্বশুরের প্রতিই করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। অল্প দিনের ভিতর মাতুলের প্রতি, ভাটার জলের মত, নিশিকান্তের শ্রদ্ধাভক্তি অল্পে অল্পে

যখন সরিয়া গেল, তখন চারিদিক্ হইতে নদীতীরের দৈন্যের মত তাঁহার ব্যবহারের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল।

হরিনাথবাবু আজ মাসাবধি কাল জ্বরে অত্যন্ত ভুগিতেছেন। কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইতেছে না। ভাগিনেয় নিশিকান্ত, অনেক বলাবলির পর মাঝে একদিন, সময় করিয়া মামাকে দেখিতে আসিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিশিকান্ত এখন কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার। সুতরাং মামাকে দেখিতে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দশ মিনিটের অধিক কাল অপেক্ষা করিতে পারে নাই। হরিনাথবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "বোশেখ মাসের রদ্দুর খাই খাই করছে, বিকালের ট্রেণে গেলে হতো না?" নিশিকান্ত প্রতিবাদ করিয়া প্রায় দেড় ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা একটী কটমট শব্দের সাহায্যে এমন একটা গুরুতর রোগের নাম করিল যাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। এবং "বলিল সেই রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। বেলা পাঁচটার সময় সেখানে যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন।" হরিনাথবাবু এই গুরুভার শব্দটীর অর্থ অভাবে চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "উমা তোর দাদাকে একটা ডাব এনে দে—নিশি এবার একটাও ডাব খায় নি।" ইদানীং নিশি এখানকার জলও বড় খাইত না। চব্বিশ বৎসরের পরিচিত জল যাহা তাহার শিশুজীবন হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ছিল, আজ তাহা অভিশপ্ত অনাদৃত জননীর মত ম্যালেরিয়ার বীজাণুতে পরিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত। মাতুলানী দুশ্চিন্তা-পীড়িত কাতর অন্তরে স্নেহপরিপূর্ণ আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিশি, কেমন দেখলি বাবা? রোগে প'ড়ে প'ড়েও উমাচরণ পরা-মাণিকের উপর আজ তোমার জন্য ডাব পাড়ান হয় নাই বলে, যে

রকম তম্বিটা কল্লে—ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগলো, বুঝি বা আবার মূর্চ্ছা হয়।" এই সময় উমা ডাবের মুখটী কাটিয়া ডান হাতে কাটারীখানি ও বাম হস্তে অতি সন্তর্পণে ডাবটী লইয়া নিশিকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দাদা, এই নাও, তোমার চারা বাগানের কোণের গাছের মিষ্টি ডাব।" নিশিকান্ত ডাব হাতে লইয়া একটি গেলাস চাহিল। উমা তাড়াতাড়ি একটা গেলাস আনিয়া উপস্থিত করিল। এবং নিশিকান্তের গেলাসে ঢালিয়া ডাবের জল খাইবার নূতন পদ্ধতি অবলোকন করিয়া অল্পবিস্তর বিস্মিত হইল। এমন অনেক দিন গিয়াছে, যখন নিশি নিজে গাছে উঠিয়া ডাব পাড়িয়াছে, উমা তলায় দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র করে সেগুলি কুড়াইয়া গৃহে বহিয়া আনিয়াছে; নিশি কাটারীর অভাবে কতদিন পেরেক দিয়া ডাব ছিদ্র করিয়া জল খাইয়াছে; আজ কিন্তু, ভ্রাতার এমন সভ্য অবস্থাটা কোনও দিক হইতেই উমার ভাল লাগিল না। নিশি বলিল—"আমি ডাক্তারখানায় গিয়া প্রেস্‌ক্রপসন লিখিয়া ঔষধ পাঠাইয়া দিব।" তারপর মামীর দিকে ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া একবার হাই তুলিল এবং বলিল "দুই চার দিনের মধ্যেই মামা সেরে যাবে। আমাকে আর আসতে হবে না।" উমা দাদার ভাব দেখিয়া পানের ডিবাটী বিছানার উপর রাখিয়া দিল। ডাক্তার হইয়া তাহার দাদা যে এতটা বদলাইয়া যাইবেন, এরূপ আশা সে যে, কোন দিন করিতে পারে নাই।

পানের ডিবার প্রতি চাহিয়া নিশি বলিল—"আমি যেখানে সেখানে পান খাই না। বরং দুটা লবঙ্গ দে'। "যেখানে সেখানে" কথাটি অকস্মাৎ নির্মেঘ আকাশে বজ্রধ্বনির ন্যায় রোগক্লিষ্ট হরিনাথের ক্ষীণ বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। তিনি সহসা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন—"নিশি, তুমি যত শীঘ্র পার উমার জন্য একটা সৎপাত্র দেখ। তা'কে

একটা সৎপাত্রে দিয়ে যে'তে পা'রলে কতকটা শান্তি পাব।" আবার তখনই দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন "তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট আছে, এই বেলা এসো বাবা, নইলে গাড়ী পাবে না।" নিশি রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। প্রকাণ্ড ঝড়ের পর বায়ু যেমন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া থাকে, নিশিকান্তের গমনের পর গৃহের সকলেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

[৪]

এক বৎসর অতীত হইল। হরিনাথবাবু কন্যা, ভাগিনেয় ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটাইয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নিশিকান্ত সপ্তমী পূজার দিন একদিন ও স্ত্রীর পীড়ার জন্য কতকগুলি ভেষজ সংগ্রহ করিতে আর একদিন মাত্র গোবিন্দপুরে আসিয়াছিল। এবং সেই উপলক্ষে মাতুলানী ও ভগ্না উমার যতটুকু সম্ভব তত্ত্বাবধান করিতে ত্রুটী প্রকাশ করে নাই। হরিনাথবাবুর স্ত্রীও নিশিকান্তের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। সে নিমিত্ত তিনিও বড় একটা নিশিকান্তের সহিত উমার বিবাহ সম্বন্ধে কথা কওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। হরিনাথবাবু রোগশয্যায় স্ত্রীর নিকট বারম্বার বলিয়াছিলেন—আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা উমার যাহাতে একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের সহিত বিবাহ হয়, সে বিষয়ে যেন যত্ন ও চেষ্টার অবহেলা না হয়।

কালাশৌচ যাইবার পর বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি নিশিকান্ত একদিন গোবিন্দপুরে আসিল। উমার জননী নিশিকান্তকে পূর্ব্বেরই মত আদর ও যত্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু সঙ্কোচের ভাব বিদ্যমান ছিল। এ-কথা সে-কথার পর উমার মা বলিলেন—"বাবা নিশিকান্ত, উমার জন্য একটা পাত্র স্থির না করিলে ত আর ভাল দেখায়

না। কপাল না ভাঙ্গিলে, উমার বিয়ে কি এতদিন বাকী থাকিত? তিনি জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই কত সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সেই তাঁর এক গোঁ—এম্‌-এ, পাশ করা ছেলে ভিন্ন উমার বিয়ে দেবো না। শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই একই কথা বলে গেছেন। আমার কষ্ট হয় তাতে দুঃখ নেই, যেমন ক'রে হ'ক; তাঁর মনোমত পাত্রে উমাকে দান কর্‌তে ।ার্‌লে, আমি এই দৈন্যের মধ্যেও আনন্দ লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বো।" নিশিকান্ত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল এম্, এ, পাশ করা পাত্রটী ত আর সহজে সংগ্রহ করা যায় না। খুব যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কেহ বিবাহ করিতে সম্মত হন এবং তাহার মধ্যে যদি বিশেষ অনুরোধ বা উপরোধ পড়ে তাহা হইলেও পাঁচহাজার টাকার কমে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। এই পাঁচহাজার টাকা এখন দেয় কে? মামা অনুরোধ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে টাকাটা যদি ঠিক করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে অনুরোধের মূল্য ছিল, এবং সে সত্য পালন করিতে কাহারও মাথার ঘাম পায়ে পড়িত না। নিশিকান্ত আরও ভাবিল দুই একটী করিয়া পাঁচ হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে কত সময় লাগে, সে জ্ঞান ত মাতুলের ছিল না। এই সময় এক সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার অভিনব দৃশ্য নিশিকান্তের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, সেই স্তূপীকৃত শুভ্র কর্পূর ধবল অর্থরাশি ব্যাকুলকণ্ঠে যেন কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"না না, আমাদের ত্যাগ করিও না—তোমার রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, আমাদের ছাড়িয়া তুমিও একদণ্ড থাকিতে পারিবে না, আমরাও তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না।" এই সময় নিশিকান্তের মাতুলানী ডাকিলেন, "নিশি, উমা আজ নিজ হাতে তোর জন্য জলখাবার ক'রেছে, এই নে খা'।"

সহসা নিশির মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়াতে তিনি চমকিয়া উঠি-

লেন। অলক্ষ্যে বৈশাখের নির্ম্মল আকাশে মেঘসঞ্চারের মত ইতিমধ্যে নিশির মুখখানি কখন যে, বিষাদভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহা তিনি দেখেন নাই। তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,"নিশি, তোর কি কোন অসুখ করেছে নাকি ?" নিদ্রোত্থিত বালক যেমন কাঁদিবার উপক্রম করিয়া সহসা হাসিয়া ফেলে, শরতের মেঘ দেখা দিয়া কখন কখন যেমন অনর্থক ভাসিয়া যায়—সেইরূপ নিশি তাড়াতাড়ি বিষণ্ণভাব লুকাইয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল—"না না, অসুখ করে নাই। উমার বিয়ের কথা ভাবছিলাম।" "উমার বিয়ের জন্য এর মধ্যে এমন কি ভাবছিলে নিশি ?" অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া নিশি বলিয়া ফেলিল, "যেমন ক'রে হউক মামার কথা ঠিক রাখতেই হবে, এম, এ পাশ করা ছেলে চাই।"

সে দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে নিশি যখন কলিকাতায় ফিরিতেছিল—তখন একটা জমাট ধোঁয়ার পাহাড় গ্রামের পার্শ্বে জমিতেছিল। দুই একটি গো-যান, ভিন্ন গ্রাম হইতে মাঠ পার হইয়া গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষকেরা এক হাতে ডাবা হুঁকো, লইয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া সারা দিনের পরিশ্রমের পর মাঠ হইতে গান ধরিয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। পুষ্করিণীর জলে স্বর্ণ-পদ্মের মত যুবতীদের কলসীগুলি তরঙ্গ হিল্লোলে দুলিতেছিল। একজন কৃষক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—"ঐ দেখ আমাদের গাঁয়ের নিশি বাবু যাচ্ছে—উনি এখন কল্‌কেতার সাহেব ডাক্তার হ'য়েছে। ওঁকে ডাক্তার ক'র্ত্তে হরিনাথবাবুর নাকি দশ হাজার টাকা খরচ প'ড়েছিল।"

আর একজন বলিল—"বলিস কিরে ? মামার অসুখের সময় নিশিবাবু কিন্তু একবেলার বেশী থাক্‌তে পারে নাই যে।"

নিশিকান্ত অন্যমনস্কভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু 'সাহেব ডাক্তার' কথাটী শুনিবামাত্র তাহার মনোযোগ তাহাদের কথোপকথনের প্রতি আকৃষ্ট

হইল। নিশি দ্রুতপদবিক্ষেপে ষ্টেশনের অভিমুখে চলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মামা পড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু সে কথাটা দেখিতেছি কাহাকেও বলিতে বাকী রাখেন নাই। মামা তাহাকে পড়াইয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, এমন একটা চিন্তা, নিশির তরফ হইতে তাহার মামাকে ঘোরতর অপরাধী সাব্যস্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। নিশিকান্ত মাঠের দিকে চাহিয়া মামার ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।

গাড়ী উদ্দাম গতিতে কলিকাতা অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মুক্ত প্রান্তরের বক্ষে, লতাবিতানে চন্দ্রের রজত-কিরণধারা উদ্ভাসিত হইতেছিল।

[৫]

অত্যন্ত গরম। রৌদ্র যেন একটা খরমূর্ত্তিতে ও রূপজ্যোতিতে দশ দিক্ দগ্ধ করিতেছিল। একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নিশিকান্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। একটা ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়িতে পাঁচ সাত মিনিট বিলম্ব আছে। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আরোহিগণ স্থান সংগ্রহ করিতে ছুটাছুটি করিতেছে। পিপাসাকাতর জিহ্বার সম্মুখ দিয়া সরবতের ঠেলা গাড়িখানি ক্রমাগত আনা-গোনা করিয়া তৃষ্ণাসংযত জিহ্বাকে বিদ্রূপ করিতেছিল। নিশি ভাবিতেছিল, এমন করিয়া দেশ বিদেশে ক্রমাগত ঘোরা ত পোষায় না। কেহ টাকা ছাড়িতে চায় না, পাঁচ হাজার টাকার কম ত কোথাও পাত্র মেলে না। এখন কি করা যায়, মামার অর্থসংস্থান না করিয়া এরূপ জিদ করিয়া যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। না হয়, তিনি আমায় শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়াছিলেন—সে ত তাঁহার কর্ত্তব্য। না করিলে লোকে নিন্দা করিত! তারপর তাঁহার পুত্র ছিল না; ছিল না বলিয়াই ত আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল এবং সত্য বলিতে

হইলে সে স্নেহে অনেকটা তাঁহার স্বার্থ ছিল। নিশিকান্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিল, আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "আমি পারিব না—আমা হ'তে কিছুতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির হইবে না। ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যুপকার ওসব কিছু নয়—আমি চাই না।" এই সময় কবাট খুলিয়া একজন যুবা গাড়িতে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া নিশিকান্ত প্রথম চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল বুঝি লোকটি তাহার মনের কথা শুনিয়া তাহাকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সদর্পে তর্কে আক্রমণ করিতে গাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে—আগন্তুকের মুখের প্রতি তাকাইয়া নিশিকান্ত কিন্তু অনেকটা সুস্থ হইল। কারণ যুবার বয়স বিংশতিবর্ষের অধিক হইবে না। মুখখানি হাস্যময় ও প্রফুল্ল। কোথাও একটুখানি চিন্তার বক্ররেখা পর্য্যন্ত পড়ে নাই। সুবর্ণের চশমাখানি গৌরবর্ণ কান্তির উপর যেন এক 'হইয়া গিয়াছে। গাড়িতে আলাপ করিবার সহজ পন্থাটি অবলম্বন করিয়া যুবক রুমালে চশমা মুছিছে মুছিতে নিশিকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"আপনি কতদূর যাবেন?"

"বঁইচি পর্য্যন্ত, আপনি?"

"মোল্লাই—"

"কোন্ ষ্টেশনে নামিতে হয়?"

তখন যুবা বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ উচ্চারণে বলিল "পাণ্ডুয়ায় নামিয়া 'মোগুলাই' যাইতে হয়, জানেন-না?"

"না, এ অঞ্চলে বড় যাওয়া আসা নেই।" "বলেন কি, হিস্‌টোরিকেল প্লেস্ পাণ্ডুয়া দেখেন নাই—এমন কি, প্রভাতবাবুর "ষোড়শী" বই পড়েন নাই? তিনি তাঁর একটি গল্পে মোগুলাইএর সন্দেশের খুব প্রশংসা করেছেন?" নিশিকান্ত হাসিয়া উত্তর করিল "প্রভাতবাবুর ষোড়শীর

সাক্ষাৎ লাভ আমার অদৃষ্টে এখনও ঘটে নাই। এবার অবসর পাইলে একবার খুঁজিয়া দেখিব।"

"বঁইচিতে কি আপনাদের বাড়ী ?"

"না, একটী পাত্রের সন্ধান করিতে সেখানে এই প্রথম যাইব।" এমন সময় গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তারপর নিশিকান্ত বলিল "একটী সৎপাত্র খুঁজিয়া বার করা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার দেখচি।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি রকম ছেলে চান ?"

নিশিকান্ত তখন ভূমিকা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, কি জন্য তিনি পাত্র অনুসন্ধান করিতেছে, এইরূপ কর্ত্তব্যপালন করিয়াই যে বর্ত্তমান হিন্দু পরিবার নিঃস্ব হইতে বসিয়াছে, ইংরাজরা এরূপ করাকে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করেন ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইল। পুরাতন হিন্দুসমাজকে অর্থহীন স্থবির বলিয়া বিদ্রুপ করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা ও উদারনীতির পোষকতা করিতে ছাড়িল না। যুবক, নিশিকান্তের কথায় একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিতেই, সে বলিল, "বলুন ত মশাই ; আপনিই বলুন। পাঁচ হাজার টাকা আজকের দিনে উপার্জ্জন করা মুখের কথা নয় ! যাহাকে উপায় করিতে হয় তাহার পক্ষে এরূপ প্রতিজ্ঞা বা আদেশ করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি কখন মরিবার পূর্ব্বে এমন অনুরোধ করিতে পারেন না।"

"আপনি কেন এত কর্‌বেন ? একটী যেমন তেমন ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিন, মামা ত আর দেখতে আসবেন না ?" সোৎসাহে নিশিকান্ত বলিল "ঠিক বলেচেন, I quite agree with you" এবার আনন্দে সে ইংরাজি বলিয়া ফেলিল। তারপর বলিল "কিন্তু—"

"কিন্তু আর কি ? ক্ষমতা নেই, পারলুম না—তার উপর ত আর কথা নেই।"

"সে ত সত্য কথা, কিন্তু অমনি মামী-মা রাগ করবেন, দেশের লোক বেইমান, নিমকহারাম, নানাবিধ বিশেষণে আমাকে ও আমার গোষ্ঠিবর্গকে বিভূষিত করবেন। তারপর অনেক অসম্ভব কথা বল্‌তেও ছাড়বেন না।"

"তাই ত, আপনি বড় বিপদে পড়েছেন দেখ্‌ছি, আপনার মামা আপনাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে সত্যই বড় অন্যায় কাজ করেছেন। পুরাতন সমাজও আপনার বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া ত আপনার ভাগ্যে ছিল, সে বিধাতাও রোধ করতে পারতেন না, আপনিই হ'তো। মামা উপলক্ষ্য মাত্র।"

নিশিকান্ত নীরবে মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনিতে লাগিল। মনে হইল কথাগুলি খুব সত্য। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। মামার বাড়ী না থাকিয়া যদি আমি অন্যত্রে থাকিতাম, তাহা হইলেও আমার ডাক্তার হওয়া ভাগ্যে যে নিশ্চিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের মত প্রত্যু-পকার-প্রত্যাশী সমাজ ও জাতি পৃথিবীতে নাই। সমস্ত জাতিটার উপর তখন নিশিকান্তের রাগ হইল। তাহারা যে সংসারে ভাগিনেয়গণের উপার্জ্জনের উপর ভাগ বসাইবার জন্য স্নেহ ও ভালবাসার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত রামায়ণ ও মহাভারতে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাইল। রামায়ণ মহাভারতের সহিত নিশিকান্তের পরিচয় না থাকিলেও এ সংবাদটি বেচারি কোন রকমে সংগ্রহ করিয়াছিল।

যুবক বলিল "ভাল কথা মনে পড়ে গিয়েছে, আমাদের গ্রামের হর-গোবিন্দ বাবুর একটী ছেলে আছে। গত বৎসর এম্, এ পাস করেছে। এখনও বিবাহ হয় নাই। হরগোবিন্দবাবু সুন্দরী মেয়ে খুঁজচেন। তাঁহারা বড় লোক, টাকা লওয়ার ঝোঁক মোটেই নেই; চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারেন।" নিশিকান্ত যুবকের নিকট আগ্রহভরে সমস্ত পরিচয় গ্রহণ করিয়া নোট বুকে লিখিয়া লইল এবং তাঁহারা যে মামার পাল্টিঘর, সে

বিষয়ও বুঝিতে বাকি রহিল না। আনন্দভরে কহিল "ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল,—বড় উপকার করলেন, তাঁরা একেবারেই টাকা নেবেন না, কি বলেন?"

"নেবেন না বলেই ত মনে হয়।"

"আসচে বুধবার দিনই আমি যাব,—আপনি কি একটু বলে রাখ্‌বেন। আমার ভগ্নী উমা, সাক্ষাৎ উমার মত রূপবতী ও গুণবতী। কাজ কর্ম্ম সকল বিষয়ে ভাল।" এমন সময় গাড়ী পাণ্ডুয়ায় আসিল। যুবক নিশিকান্তকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। নিশিকান্ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করে নাই। তাড়াতাড়ি নোট বই খানি বাহির করিয়া বলিলেন "একটা কথা, মাফ্‌ করবেন, আপনার নাম?"

"শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

এমন সময় গার্ড হুইসিল দিল। নিশিকান্ত জানালার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া, দুইটি হাত জোড় করিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "নমস্কার, যোগেন্দ্রবাবু, নমস্কার"।

[৬]

হরগোবিন্দবাবু যোগেন্দ্রের জননীর নিকট সকল কথা শুনিয়া ও হরিনাথবাবুর ভাগিনেয়ের প্রতি পুত্রাধিক আচরণের কথা জানিয়া মুগ্ধ হইলেন। এবং তাঁহার বাসনা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, উমাকে আপনার পুত্রবধূ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিশিকান্ত আসিলে, তিনি তাহার মুখেও সকল কথা শুনিলেন। বৃদ্ধ কৌশলে এটাও বুঝিলেন, যে, নিশিকান্তের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, এবং নিশিকান্তের দাদামহাশয় ও মামা তাঁহার পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। নানা কথায় হরগোবিন্দ বাবু এটাও জানিলেন যে, নিশিকান্তের উপস্থিত

আয় প্রায় মাসিক পাঁচশত টাকা, কিন্তু তথাপি ভগ্নীর বিবাহে কিছু খরচ না করিতে হইলেই সে বাঁচিয়া যায়।

নিশিকান্ত বলিল "আমায় কি কি দিতে হবে, অনুগ্রহ করে যদি তার একটা ফৰ্দ্দ দেন ?"

হরগোবিন্দবাবু সটকার নলটি মুখ হইতে নামাইয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিবেন, "দেনা-পাওনার কথা বলছেন ? তা আপনার মামা ত কিছু রেখে যেতে পারেন নাই বল্লেন—বিধবার নিকট কি আর দাবী করতে পারি ? হরিনাথবাবুর সম্বন্ধে আপনার মুখে যেরূপ শুনলাম তাতে ফৰ্দ্দ দিবার কিছু নাই। আপনি যান, গিয়ে বিবাহের আয়োজন করুন।" এই সময় যোগেন্দ্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশিকান্ত তাহাকে সাগ্রহে নমস্কার করিয়া বলিল "কেমন আছেন ?" যোগেন্দ্র প্রতিনমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিল "ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন ?" হরগোবিন্দ উভয়ের আলাপে বাধা দিয়া বলিলেন, "এইটী আমার বড় ছেলে, এবার বি-এল পাশ করেচে ; এম, এ,তে second হ'য়েছিল।" যোগেন্দ্র মস্তক নত করিয়া রহিল। নিশি-কান্তের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে তখন হরগোবিন্দবাবুকে এতটা অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ দিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইল না ; অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল "আপনার মত লোক আজ কাল দেখা যায় না"। হরগোবিন্দবাবু মৃদু হাসিয়া সটকার নলটিতে একবার টান দিলেন ও আকাশের দিকে চাহিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এখনও তবু দুএকজন দেখতে পাচ্ছেন, কিছু দিন পরে আর পাবেন না। আমারও শমন বেরিয়েছে, শিগ্‌গিরই ধরাবে। আমি কিন্তু ভাব্‌চি, যে আপনার মামার মত লোক এ সংসারে খুব কম মেলে—"

নিশিকান্ত থতমত খাইয়া কথাটার উত্তরে ঢোক গিলিয়া বলিল—

"তা ঠিক।" এই উত্তরটা কিন্তু কথোপকথনের মধ্যে এতটুকুও প্রাণের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল না, বরং হরগোবিন্দবাবুর অধরসংলগ্ন নলনির্গত ধূম্ররাশির মধ্যে অল্প প্রচ্ছন্ন হাসি ভাসিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সমস্ত ঠিক করিয়া নিশিকান্ত চলিয়া গেল। কিছু দিতে হইবে না, এই কথাই স্থির রহিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে, নিশি ভাবিল, একবারে কিছু যে দিতে হইবে না, ওটা কথার কথা, —সকলেই বলিয়া থাকেন।

[৭]

বিবাহসভা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। নিশিকান্ত একজন বড় ডাক্তার। সুতরাং নাম ও মান রক্ষার খাতিরে সভাপ্রাঙ্গন সাজাইতে সে অনেকগুলি টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছে। এই ব্যয়ের মধ্যে অনেকটা যে, তাহার ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার হইবে এবং ভবিষ্যতে উপকার আছে, জানিয়াই সে অনিচ্ছাস্বত্ত্বে টাকার প্রতি, সেদিন নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হইয়াছিল। বিবাহ নিশিকান্তের কলিকাতার বাটীতেই হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ও বড়লোকদের সে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, এটা কলিকাতার একটা বিশেষত্ব, তাহা না হইলে মানসম্ভ্রম বাড়ে না। অনেক যৌতুক ও উপহার নিশিকান্তের গৃহে সেদিন প্রবেশাধিকার লাভ করিল। বিবাহমণ্ডপে একখানি অতি সুক্ষ্ম রূপার থালের উপর নূতন চক্ চকে পাঁচ শত টাকা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। দান-সামগ্রীগুলি অত্যন্ত সাধারণ। একটী অল্প ওজনের রূপার ডিবা ও গেলাস ছিল। অনেকেই নিশিকান্তের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল। পরের জন্য এতটা কেহ করে না। তাহার কন্যা নয়, নিজের সহোদরা ভগ্নী নয়, মামাতো ভগ্নী—বাহবার বাহারে নিশি-

কান্ত তখনকার মত টাকার শোক বিস্মৃত হইয়াছিল। নিশিকান্তের মামী সূর্য্যমুখী একটী ঘরে বসিয়া কন্যাকে সাজাইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এই আনন্দের দিনেও গোপনে কাহার জন্য অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতেছিলেন। এখানে কর্ত্রীত্ব করিবার মত কাজ তাঁহার হাতে আজ মোটেই কিছু ছিল না। নিশিকান্তের শ্বশুরশাশুড়ীই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তাহার উপর সূর্য্যমুখী এখানকার কেহ নন, কাহারও সহিত পরিচয় নাই—এ বাড়ীতে অত্যন্ত অপরিচিতার ন্যায় একধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই তিনি সঙ্গত ও শোভন বলিয়া মনে করিলেন। সকলেই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "ইনি হ'চ্ছেন নিশির মামী, এঁরই মেয়ের বিবাহ। নিশি খুব ভাল ছেলে, তাই এতটা টাকা খরচ ক'রে মামাতো ভগ্নীর বিবাহ দিচ্ছে।" সূর্য্যমুখী ইহাতে সঙ্কোচ ও দীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু উপায় নাই। বুদ্ধিমতী উমাও জননীর মুখের ভাবে তাঁহার অন্তরের ব্যথা বুঝিল। সূর্য্যমুখী স্বামীর আদেশ পালন করিতেই এতটা অপমান স্বীকার করিতেছিলেন। নতুবা দরিদ্রের গৃহে, নিজ ব্যয়ে কন্যার বিবাহ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ মনে করিতেন না। সূর্য্যমুখী স্বামীর একটী হীরার আংটী জামতাকে বিবাহে উপহার দিবার জন্য এতদিন তুলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেটী আজ অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু এবাড়ীর ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেটী আর সাহস করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে বর অসিল। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সূর্য্যমুখী জানালা দিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই পাত্র সুন্দর, তাঁহার কন্যার উপযুক্ত। এ ক্ষেত্রে নিশিকান্তের নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। বরযাত্রী, বর, পুরোহিত ও নাপিত লইয়া দশজনের বেশী আসে নাই, পাছে

নিশিকান্তের অধিক ব্যয় হয়। এ ব্যবস্থা হরগোবিন্দবাবু নিজ হইতেই করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে বর আলিপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর আসিয়া উপবেশন করিল। পার্শ্বের পিঁড়ায় উমাকে বসান হইল! বরণ করিবার কাজটা সূর্য্যমুখী মনে মনে ভাবিতেছিলেন কে করিবে,—তাঁহার ভাগিনা-বৌ, না, নিশির শ্বাশুড়ী; ইহা ভাবিয়া তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বরণ করিবে কে?"

এতক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, এবাড়ীতে তাঁহার মত লইবার প্রয়োজন আছে।

তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলে, "আমার বৌমা।"

এই সময় বরের পিতা বলিলেন, "যোগেন্দ্র বিবাহ করিব না, কথামত কাজ হয় নাই।"

নিশি শুনিয়া ভাবিল পাঁচশত টাকায় বুঝি মন উঠে নাই। তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল "কি হ'য়েছে? না হয় আর দুই শত টাকা দিতেছি।"

যোগেন্দ্র বলিল, "নিশিবাবু আপনার কিছুই দেবার কথা ছিল না। তবে অনর্থক কেন এতগুলি টাকা অপব্যয় করিলেন? বরাভরণ ও টাকা উঠাইয়া লইয়া যান। নতুবা বিবাহ করিব না।" সূর্য্যমুখী আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, শেষ কথা কয়টি শুনিয়া তিনি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

যোগেন্দ্র কোন কথা শুনিল না। সমস্ত দ্রব্য সেখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। যোগেন্দ্র বলিল "দুই ঘণ্টা পরে যিনি আমার স্ত্রী হবেন, যাঁহার সকল ভারই দুই দণ্ড পরে

আমরণ আমাকে বহন করতে হবে, আমি কিছুতেই ইচ্ছা করি না, যে আমার সেই স্ত্রীর প্রতি কেহ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবার নিমিত্ত অবজ্ঞায় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।" সভাস্থ সকলে এই কথায় নির্ব্বাক হইয়া গেল। নিশিকান্তের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর অন্তর স্বামীর সম্মানগৌরবে ভরিয়া উঠিল। স্বামীকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে, তিনিই আজ এই মহাপ্রাণ যুবকের অন্তরে যে ভাব ও শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহা নিশি বা অপরে কোথায় পাইবে? নিশি ইঙ্গিত করিতেই সকল দ্রব্য অপসারিত করা হইল। সহসা উমার লাল চেলীখানি খস খস করিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই দেখা গেল, যে, নিশির প্রদত্ত অলঙ্কার কয়েকখানি উমা উন্মোচন করিয়া সম্মুখস্থ রেকাবে ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে রাখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী মনে মনে অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হইলেন। যোগেন্দ্র পল্লীবালিকার নিকট কোন দিন এতটা সৎসাহস আশা করিতে বা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এই সময় উমা ও যোগেন্দ্রের মধ্যে বিধাতা যে অনুচ্চারিত মন্ত্র পড়িয়া দিলেন, তাহা উভয়কে অচিরে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর শুভদৃষ্টির সময় যখন যোগেন্দ্র বালিকার নয়নের প্রতি তাকাইল, তখন দোখল কৃতজ্ঞতার অশ্রুভারে দুইটি আঁখি তাহার করুণাভিক্ষা করিতেছে। সারাবিশ্বের কোথায় যেন সেদিন অপর কিছু নাই, কেবল করুণা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে সূর্য্যমুখী অঞ্চল হইতে অঙ্গুরীটি উন্মোচন করিয়া বলিলেন "বাবা এটী তোমার শ্বশুরের দান।" যোগেন্দ্র মাথায় স্পর্শ করিয়া আনন্দে উহা হস্তে ধারণ করিল।

ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার।

১

সেদিন দুপুর হইতেই মেঘ করিয়াছিল। একটা আসন্ন বর্ষণ প্রতিক্ষণেই যে আসিতে পারে, ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফূরণ ও মেঘগর্জ্জন তাহার আশঙ্কা দেখাইতেছিল।

শ্রাবণ মাসের শেষ। পদ্মা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটু বিস্তৃত হইলেই যেন সব একাকার হইয়া যাইবে। নদীকূলে যাহাদের অস্থায়ী ঘর ছিল, তাহারা পদ্মাকে বিলক্ষণ চিনিত; সুতরাং পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই বাতাস অল্পে অল্পে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল। বড় বড় বৃক্ষগুলি মাতালের মত টলিতে লাগিল। এক একবার মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তখনই উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল। পদ্মা বিপুলবিক্রমে নাচিয়া উঠিল—মাঝিরা জোর করিয়া হাল চাপিয়া ধরিল, দাঁড়িরা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় বাহিতেছিল—কাহারও মুখে কথা নাই।

পদ্মার কূলে বালির উপর প্রবোধদের আপিস। আপিসের অল্প দূরেই বাসা। এখানে বড় লোকের বসবাস নাই। আপিসের জনকয়েক বাঙ্গালী, কয়েকজন সাহেব ও কুলি, খালাসী, চাকরবাকর লইয়াই স্থানটি পরিপূর্ণ। সে দিন আপিস হইতে ফিরিয়া প্রবোধ তাহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া বন্ধু করুণার সহিত ঝড়ের গল্প করিতেছিল। অল্পদিন হইল তাহারা এখানে আসিয়াছে।

এই সামান্য দিনের পরিচয়ের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় প্রণয় তাহাদের ভিতর জাগিয়াছিল, যেন আশৈশব তাহারা একত্রে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত।

পদ্মার দিকে জানালাটি খুলিয়া তাহারা উত্তাল জলতরঙ্গের ভীষণ নৃত্য দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। হুহু শব্দে বাতাস রুদ্ধ কবাটও জানালায় আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল। পদ্মাবক্ষে একখানি তরণী ঝড়ের মুখে, ঢেউয়ের মাথায় খরস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছিল—চারিদিকে তরঙ্গ উঠিয়া নৌকখানিকে যেন পরমুহূর্ত্তেই গ্রাস কবিবার উপক্রম করিতেছিল। তাহারা একদৃষ্টে নৌকাখানির দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকাখানি আর দেখা গেল না।

প্রবোধ বসিয়াছিল; ভয়ে সে দাঁড়াইয়া উঠিল—তাহার হস্তপদ কম্পিত হইল। বলিল—"যা, ও কি বাঁচে!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তলিয়ে গেল—ওঃ! কি ভয়ানক!" সহানুভূতির স্বরে, করুণারও প্রাণ ব্যাকুল হইল। করুণা এতক্ষণ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও অচেতন হইয়া সেদিকে চাহিয়াছিল। সহসা উৎসাহ পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বাহবা মাঝি! প্রবোধ, ঐ দেখ নৌকা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসেছে। মাঝি শক্ত না হলে আর এ ঝড়ে বেরিয়েছে?"

প্রবোধ যেন নিজে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; কিন্তু পরক্ষণেই তরঙ্গ আরও প্রবল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

প্রবোধ এখানকার একজন ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। এক বৎসর হইল পাশ করিয়া চাকরী লইয়া এখানে আসিয়াছে। করুণা এই আপিসের একজন কেরাণী।

প্রবোধ বলিল, "আজকে সাহেবকে ব'লে নদীতীরের আলোগুলা জ্বালিয়ে রাখা ভাল। এই দুর্য্যোগে অনেক সুবিধা হ'তে পারে।

রাত্রে মাঝিরা আলো দেখে বিপদের সময় কিনারা ঠিক করতে পারে।”

করুণা বলিল, “যে সাহেব, জানই ত—তিনি কি রাজী হবেন?”

প্রবোধ কোন কথা না বলিয়া ‘হারিকেন’ লণ্ঠন হস্তে লইয়া সেই ঝড়ের ভিতর সাহেবের বাংলার অভিমুখে যাত্রা করিল। করুণাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সাহেব প্রবোধের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

“আজ রাত্রে কাহার ‘পাওয়ার হাউসে’ থাক্‌বার পালা?”

প্রবোধ উত্তর করিল, “ডয়েল সাহেবের।”

“যেরূপ ভয়ানক ঝড় হচ্ছে, একটা বিপদ হবার খুব সম্ভাবনা। সে নিমিত্ত কিছু পূর্ব্বে আমি তাহাকে ‘পাওয়ার হাউস’ বন্ধ কর্‌বার আদেশ দিয়াছি বাবু” বলিয়া নির্ব্বানোন্মুখ চুরুটটী টানিলেন।

“যদি অনুমতি করেন—”

সাহেব তাড়াতাড়ি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হুকুম দিয়া তাহা প্রত্যাহার করা আমার স্বভাব নয়।”

“আজ্ঞে সে কথা বল্‌চি না। আজ ‘পাওয়ার হাউসে’ যদি আমাকে থাক্‌তে অনুমতি দেন—”

সাহেবের চক্ষের তারা খুব উজ্জ্বল দেখাইল। মুখে বেশ একটুখানি আশ্চর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। বিদ্যুৎস্ফূরণের মত ক্ষণকালের নিমিত্ত দুইটি অধর ওষ্ঠের মধ্যস্থিত চুরুটের ফাঁকে একটুখানি প্রচ্ছন্ন হাসি দেখা দিয়াই লুকাইল। পরক্ষণেই সাহেব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। করুণা ভীত হইল। দুর্দ্দান্ত সাহেবের নিকট কোন বাঙ্গালীই এতক্ষণ ধরিয়া কথা বলিবার

সাহস করে না। সে পশ্চাৎ হইতে প্রবোধের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ঠিক সেই সময়, বাহিরে বাতাস গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝটকা আসিয়া গৃহভিত্তি হইতে বহুমূল্য একখানি চিত্র টানিয়া মেঝের উপর ফেলিল। ছবিখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্রবোধ সেদিকে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিবার পূর্ব্বেই, সাহেব অচঞ্চলভাবে বলিলেন, "বাবু, ছবি ভেঙ্গে গেছে, তুমি জুড়তে পারবে না। অনর্থক পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নাই। নতুবা আমি নিজে নিশ্চিন্ত থাক্‌তাম না জানবে।"

ইহার পর, সকলে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সাহেব একমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে চুরুটের ধোঁয়া তাঁহার জাগ্রত অবস্থার প্রমাণ দিতেছিল। বাহিরে প্রলয় প্রকৃতির প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল। গৃহের জানালা-দরজাগুলি বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সহসা সাহেব বলিলেন, "বাবু তুমি ছেলে মানুষ। তোমার এখনও সংসারের অভিজ্ঞতা বেশ হয় নাই। তুমি একা 'পাওয়ার হাউসে' এই দুর্য্যোগে থাক্‌তে পারবে?"

প্রবোধ উৎসাহভরে উত্তর করিল, "পারব।"

"দেখো বাবু, যেন কোনরূপ গোলমাল হয় না। জান ত ঝড়ের সময় খুব সাবধানে কাজ করতে হয়।"

"সে বিষয়ে কোন ভাবনা নাই।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা যাও।" পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন—"কিন্তু দেখিও যেন কোনরূপ গোলযোগ না হয়।"

প্রবোধ ও করুণা উভয়ে সাহেবকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

[২]

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আর একটু পরেই সাহেবের পূর্ব্ব

আদেশ মত 'পাওয়ার হাউস' বন্ধ হইবে। আকাশ তেমনই মেঘাচ্ছন্ন। বৃক্ষগুলি প্রেতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারে নাচিতেছে। বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া ছুটিতেছে। বড় বড় ঢেউগুলি নদীসৈকতে আছাড়িয়া পড়িতেছে ও ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

ইয়ার্ডে কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলেই বাসায় উদ্বিগ্ন অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। কেবল সাহেবদের বাংলা হইতে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের উচ্চ কলরোল শ্রুতিগোচর হইতেছিল। সে উচ্ছৃঙ্খল হাস্য তখন বীভৎস বিকট বিভীষিকার মত মনে হইতেছিল। কেবল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলা নিস্তব্ধ। প্রবোধ তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া করুণার বাসায় গিয়া তাহাকে বলিল, "কি হে যাবে না কি?" করুণা বলিল, "চল, কিন্তু ভাই আজ অত্যন্ত মাথা ধরেচে, যেন খসে পড়্চে, মাথা তুলতে পার্চি না।"

প্রবোধ একটু ভাবিয়া বলিল—"যেরূপ দুর্য্যোগ, তোমার যখন মাথা ধরেছে, তখন আজ আর গিয়ে কাজ নাই। শেষে কি একটা অসুখ করে বসবে" বলিয়া সে বাসা হইতে একাই বাহির হইয়া পড়িল। বাসা হইতে ইয়ার্ড পাঁচ মিনিটের পথ। ইয়ার্ড হইতে 'পাওয়ার হাউস' পদ্মার ধারে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌছান যায়।

প্রবোধ দেখিল, কেবল সাহেবদের বাংলার বাতিগুলিই জ্বলিতেছে। ইয়ার্ডের প্রায় সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই একটী মাত্র বাতি ইয়ার্ডের মাঝে মাঝে জ্বলিতেছে। দুই এক স্থানে খালাসীরা এটা-সেটা নাড়িতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঞ্জিনগুলা সমস্ত দিন যেন যুদ্ধ করিয়া মৃতের মত নির্জ্জীবভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাহারা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে অসুরের শক্তিতে চলিয়াছে এবং বজ্রের শব্দে ইয়ার্ড প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, এখন তাহাদের অবস্থা দেখিলে সে কথা

মোটেই মনে হয় না। ঠাণ্ডা বাতাসে, প্রবোধের বেশ একটু শীত শীত করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, করুণাকে না আনিয়া ভালই করিয়াছি, এ উদ্দাম বাতাসে নিশ্চয়ই তাহার অসুখ করিত। তারপর তাহার মনে হইল, করুণা খুব পরিশ্রমী; এই কয়মাসে সে 'বাতিঘরের' কাজ বেশ শিখিয়াছে। তা'র উৎসাহ দেখে' আশ্চর্য্য হ'তে হয়। সারা দিন কেরাণীগিরি করেও রাত্রে আমার সঙ্গে সমানে 'ডিউটি' করে। আজকাল ত সেই সব করে, আমাকে কিছুই করতে হয় না। আর মাসখানেক পরে, একবার সাহেবকে তা'র কাজ দেখিয়ে আশ্চর্য্য করে দিতে হবে।

করুণারও এ বিষয়ের বেশ একটা নেশা জন্মিয়াছিল। প্রবোধের রাত্রে 'ডিউটি' থাকিলে, সে তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে বাতিঘরে যাইত। প্রবোধকে নানারূপ প্রশ্ন করিত। এটাকে কি বলে, এ হাতলটা ধরিয়া টানিলে কি হয়? এ তারটায় হাত দিলে কি হয়? প্রবোধ একে একে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছিল। প্রথম প্রথম কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া সে বাতি জ্বালিবার ("সুইচ") হাতলটি উঁচু করিয়া দিলে যখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আলোক নিবিয়া যাইত, তখন সে পরিহাস করিয়া বলিত, "আমার শক্তি অসীম, ইচ্ছা করিলে আলো দিতে পারি, আবার আলো নিতেও পারি।" তখন উভয়ের মধ্যে হাসির ধুম পড়িয়া যাইত। কেহ কোথাও নাই; রাত্রিতে দুইটি বাঙ্গালী যুবক এমনই করিয়া নির্জ্জন নদীতীরে তাহাদের কর্ম্মভার-পীড়িত প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলিকে আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিত। প্রবাসের দীর্ঘরাত্রিগুলি বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটিয়া যাইত। পদ্মার কলকল শব্দ, কখন কখন মাঝিদের বিরহসঙ্গীত, বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের নির্জ্জন নিশীথের সঙ্গী হইত। কোন কোন দিন রাত্রে

মাঝিরা পদ্মায় মাছ ধরিত, সুতরাং জাল ফেলার শব্দ শোনা যাইত। করুণা মজা করিবার নিমিত্ত নদীর কিনারার আলোগুলি সব এক সঙ্গে জ্বালাইয়া দিত। আলো দেখিয়া মাছ পলাইয়া যাইত। মাঝিরা বিরক্ত হইত। আবার কোন কোন দিন নির্ব্বোধ খালাসী যখন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া ঢুলিত, তখন তাহার গায়ে ব্যাটারী ঠেকাইয়া দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দেওয়া হইত। তারপর তাহাকেই সে রাত্রির জন্য গল্পের নায়কের আসনে বরণ করিয়া গল্পগুজব চলিত। হাজিপুর জেলায় তার ঘর। ছয় বিঘা ক্ষেত আছে—দু'খান লাঙ্গল, চারিটা গরু, তিনটা আম গাছ, বুড়া মা, এ সকল কথা খুব আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে সে বলত। আর কেউ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করলে, সে অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিত না—নীরব হইয়া থাকিত, অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিত—সে আজ পাঁচ বৎসর নক্‌রী করতে এসেছে। আসবার সময়, সে সাদি করে এসেছে, সে বৌ ঘরে আছে। বলিতে বলিতে সে একটু উতলা হইত ও বলিত এইবার ছুটি নিয়ে বাড়ী যাইব। অমনি সে বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত। কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিত, "বাবু আমার ছুটি করিয়ে দিন।" প্রবোধ বলিত, "তুই তোর বৌকে কেন এখানে নিয়ে, আয় না, আমি আমার বৌকে নিয়ে আসব। তুই ও তোর বৌ, আমাদের বাড়ী থাক্‌বি।"

সে বলিত, "তা হয় না বাবু, তা হয় না; বুড়া মার কি হবে?"

[৩]

সে রাত্রিতে সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম-কেদারায় শুইয়া শুইয়া বই পড়িল। তিনি দশ বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন,—মধ্যে কেবল একবার বিলাত গিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিয়াছিল, সাহেব বোধ হয় বুড়া বয়সে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন। এবার সাহেবের মেজাজ

ভাল হইবে; কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন বধূর পরিবর্ত্তে একরাশ বই লইয়া আসিলেন। সাহেব বড় কাহারও, সহিত মিশিতেন না। কাজ ও কেতাব তাঁহার জীবনের সঙ্গী ও সাথী ছিল। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাহারও সহিত বড় হাসিয়া কথা বলিতেন না। সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভীত হইত।

সকলে মনে মনে ভাবিত, লোকটা সংসার-ধর্ম্ম করিল না, সে জন্য মায়া মমতা কিছুই বুঝিল না। অন্যান্য সাহেবেরা পর্ব্বোপলক্ষে, নাচে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে, কোনদিনই তিনি যোগ দিতেন না। কাজ ও বই ভিন্ন বোধ হয় আর কিছু তাঁহার চিত্তহরণ করিতে পারিত না।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। সাহেব অন্যদিন ঠিক নয়টার সময় শয়ন করেন; কিন্তু সেদিন বেহারা নয়টার পর, দুইবার অছিলা করিয়া ঘরে ঘুরিয়া গেল, এটা-সেটা নাড়িয়া ঘড়ির দিকে চাহিল—সাহেব একবার পুস্তক হইত নয়ন তুলিয়া তাহার প্রতি তাকাইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দিকেও চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু একটীও কথা বলিলেন না। বেহারা অগত্যা দ্বারের নিকট বসিয়া বসিয়া, ঢুলিতে লাগিল—আর মনে মনে সাহেবকে বিলম্বের নিমিত্ত তাহার যতগুলি মিষ্ট বচন জানা ছিল, প্রয়োগ করিল।

সাহেব কেতাব রাখিয়া গৃহের মধ্যে পদচারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখে নানাপ্রকার চিন্তার ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। সহসা তিনি একখানি চিত্রের নিকট গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্মিতভাবে তাহা দেখিতে লাগিলেন। চিত্রখানি ক্যাসেবিয়াঙ্কার। বালক, পিতৃদেবের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। লোহিতবর্ণ অগ্নিরাশি বিপুল বিক্রমে তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, নির্ভীক বালক তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছে

না—বরং উৎকর্ণ হইয়া পিতার আদেশের অপেক্ষাই করিতেছে। চিত্র-খানি দেখিতে দেখিতে, সাহেবের হৃদয়ে করুণার উৎস উছলিয়া উঠিল। তারপর, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম-কেদারায় শুইয়া, এক মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ যেন বহুদিনের নিস্তব্ধ রুদ্ধ-গৃহে উৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিল। কৃপণের গৃহে দানসাগর আরম্ভ হইল। সাহেব আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "এই দুর্য্যোগে 'পাওয়ার হাউস' খুলিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া ভাল কাজ করি নাই। বাবু ছেলেমানুষ, যদি কোন বিপদ হয়, তবে আমিই তার জন্য দায়ী। বাবুর অন্তর অত্যন্ত পবিত্র। পরের জন্য যাহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, সেই ত মানুষ! একবার মনে করিলেন, আমিও তার সঙ্গে গিয়া কাজ করি;—না, না—তাহা করিলে তাহার কাজের অংশ লওয়া হইবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। পদ্মার দিকের বাতায়ন খুলিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। একদৃষ্টে 'বাতিঘরের' দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, নদী ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়াছে, কাহারও সাড়াশব্দ নাই, কেবল বৃষ্টিপতন ও নদী-গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে এবার বারটা বাজিয়া গেল। সাহেব কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলেন না। জানালার গরাদ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ সেদিন বালকের মত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছেন, দেখিয়া বেহারা ভাবিল, সাহেব কি পাগল হইল? সাহেব ত কোনদিন এমন করে না; সাহেবের ভাবভঙ্গী বেহারার বড় ভাল বোধ হইল না, বরং দেখিয়া আশঙ্কা হইল। খানিক পরে সাহেব ডাকিলেন "বেয়ারা?" বেয়ারা "হুজুর" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও।" বেহারা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

[৪]

প্রবোধ প্রতিদিন 'বাতিঘরে' আসিবার সময় একটি 'হারিকেন' লণ্ঠন হাতে করিয়া আনিত। সেদিন সে শূন্যহস্তেই আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, 'বাতিঘরে'র লণ্ঠনটি খালাসী নিবাইয়া রাখিয়াছে। 'বাতিঘরের' আলোটি সারা রাত্রি জ্বালাইবার নিয়ম ছিল সত্য, কিন্তু তাহা কোনদিনই জ্বলিত না। যেদিন বড় সাহেব স্বয়ং আসিতেন, সেইদিনই খালাসী আলো জ্বালাইত এবং তাহার উপরি লাভ সেদিন মোটেই হইত না। প্রবোধ কোনদিনই তাহাকে আলো জ্বালাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না; কারণ সে নিজে আলো লইয়া আসিত।

প্রবোধ 'বাতিঘরে' আসিয়া অনেকক্ষণ অবধি নদীর দিকের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পদ্মার অবস্থা দেখিতে লাগিল। ভাবিল, কত লোক হয় ত, এই দুর্য্যোগের পূর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—হয় ত, তাহারা এখনও তীরে উঠিতে পারে নাই! তাহার মনে নানারূপ চিন্তা আসিতেছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়ীদের দাঁড় ফেলার শব্দ ও মাঝির কথা 'হুঁসিয়ার হয়ে ভাই—হুঁসিয়ার হয়ে', শ্রুত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবোধ ডাকিল, "খালাসী।"

খালাসী তখন তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল—তা'র নববধূ বড় অভিমান করিয়াছে,তাহার সহিত কথা কহিতেছে না, সে কত সাধ্যসাধনা করিতেছে, তথাপি সে, যেন সে দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না। খালাসী তন্দ্রাবস্থায় হাত বাড়াইয়া কাহাকে ধরিতে গেল, তারপর তার অধর-পল্লবের উপর মৃদু হাসি বিকশিত হইল। প্রবোধ ভাবিল, আহা বেচারী হয় ত, তা'র বাড়ীর স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছে। এই সময় সহসা তার দৃষ্টি ইয়ার্ডের বাহিরের দিকে পড়িল। কিছু পূর্ব্বে যে সব

সাহেবের বাংলায় নৃত্য গীত হইতেছিল, এখন সেগুলি নীরব নিস্তব্ধ। আলো নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কেবল একটী বাংলায়, একটী মাত্র আলো ধ্রুব তারার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। প্রবোধ অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। এত রাত্রি পর্য্যন্ত কাহার ঘরে আলো জ্বলিতেছে? এই প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসে, কে বাতায়ন মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে? তারপর মনে মনে হিসাব করিয়া ঠিক করিল, ও কুঠী তাহারই বড় সাহেবের! তবে কি, বড় সাহেব এখনও ঘুমান নাই? আমাকে বাতিঘরে কাজ করিতে আদেশ দিয়া কি তাঁর বিশ্বাস হয় নাই? এই সময় ঘড়িতে সাড়ে বারটা বাজিল। প্রবোধ মনে মনে বলিল, আমরা সাহেবকে যতটা দুর্দ্দান্ত মনে করিয়া আশঙ্কা করি, তিনি কিন্তু ততটা ন'ন। আজ ত সাহেব, আমাদের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা বল্‌লেন। দূর থেকে কাহাকেও ঠিক করা যায় না।

তারপর সে মনে করিল, ইয়ার্ডের আলোগুলি আর কেন অনর্থক জ্বালাইয়া রাখি। অমনি সে ডাকিল, "খালাসী, বাতি লেয়াও";—এবার খালাসীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন খুঁজিতে উঠিল, কিন্তু প্রবোধ দেখিল, লণ্ঠন এক সেকেণ্ডের নিমিত্ত প্রয়োজন; সুতরাং বাতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে প্রধান সুইচটি (মেন) বন্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্তের ভিতর নদীতীর, ইয়ার্ড, সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। খালাসীর তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। একহাত ব্যবধানে অপর ছোট সুইচ। সেটি খুলিয়া দিলে কেবল নদীতীরের সমস্ত আলো ও ইয়ার্ডের মধ্যে দুই একটি মাত্র বাতি জ্বলে। কতদিন প্রবোধ এমন অন্ধকারে ঠিক সুইচে হাত দিয়া অন্যমনস্কভাবে আলো জ্বালিয়াছে; কিন্তু সেদিন ঠিক জায়গায় হাত দিতে পারিল না। যেখানে তাহার হাত পড়িল, সেখান হইতে তার হাত আর নড়িল না। তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে

তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। সে নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে সাহেব যখন দেখিলেন, এক মিনিট অতীত হইয়া গেল, তথাপি কোন আলো জ্বলিল না, তখন তিনি বাংলায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ যেন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "Oh poor boy, what have you done?" রাত্রির পরিচ্ছদেই তিনি পাগলের মত নগ্নপদে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। বৃদ্ধের তখন কোন দিকে লক্ষ্য নাই। অন্ধকারে তাঁহার পায়ে কি একটা লাগিল, তিনি পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলেন। খালাসী ইতিমধ্যে বাতি জ্বালাইয়া দেখিল, বাবু সুইচ বাক্সের নিকট মৃতের মত দাঁড়াইয়া আছেন।

সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বাবু?—বাবু?" কোন উত্তর নাই। তখন সে সাহেব, করুণাবাবু ও অপর ইলেকৃট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার নরেনবাবুকে সংবাদ দিতে দৌড়াইল।

করুণার সেদিন মাথা ধরিয়াছিল। সুতরাং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা আসে নাই; বসিয়া বসিয়া অন্যতম ইলেকৃট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার নরেন বাবুর সহিত গল্প করিতেছিল। তখন প্রায় দুই তিন মিনিট অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় করুণা বলিল, "নরেনবাবু, কেন বলুন দিকি সব আলো একেবারে নিবে গিয়েছে? এখনও জ্বল্‌ছে না?"

নরেনবাবু উত্তর করিলেন, "বোধ হয়, যেন মেন সুইচ্ 'অপ' করিয়া ছোট সুইচটি খুলিয়া দিবার নিমিত্ত আলো নিবিয়া গিয়াছে।"

"তাহ'লে কি এত দেরী হয়? সে ত এক সেকেণ্ডের কাজ।" কথাটি নরেনের মাথায় গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল, বলিল "ভাল কথা নয়, চলুন দেখিগে ব্যাপার কি?" দ্রুতপদে উভয়ে বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পথে খালাসীকে আসিতে দেখিয়া তাহারা বিপদ

গণিল। খালাসী তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবু প্রবোধবাবুকো বিজুলী লাগা হ্যায়।”

তখন তিনজনে ছুটিয়া চলিল। করুণা বলিল, “যদি আজ তার সঙ্গে থাক্‌তাম, তাহ’লে এমনটা কিছুতেই হ’তে পারত না।”

অল্পদূর যাইতে না যাইতে সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল। করুণা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; বলিল, “তবে হয় ত প্রবোধ সামলাইয়া লইয়াছে।” তখন সকলের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

‘পাওয়ার হাউসে’ গিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাহেব নিজে ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আলো তিনিই জ্বালাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পাজামা, গায়ে মাত্র একটি গেঞ্জি—পায়ে জুতা নাই; কিন্তু মোজা পরা আছে এবং এক পায়ের মোজা রাঙ্গা ও অপর পায়ের মোজা সাদা। সাহেব প্রবোধকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হাত দুইটি অত্যন্ত জোরে নাড়িতে-ছেন। মাঝে মাঝে মুখের উপর মুখ দিয়া ফুঁ দিতেছেন—ক্ষিপ্রগতিতে কখন উঠিয়া তাহার পদদ্বয় টানিতেছেন। করুণা ও নরেনকে দেখিয়া বলিলেন, “তোমরা কিছু ভাল উপায় জানু কি? নরেনবাবু আমাদের সেই ‘চার্টখানা’ শীঘ্র নিয়ে আসুন। বাবু আপনি একে দাঁড় করাইয়া ধরুন দেখি।” তারপর সাহেব কত প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তথাপি প্রবোধের চেতনা হইল না। সমস্ত শরীর ক্রমে হিম হইয়া আসিল। নরেন দেখিল, সাহেবের পা কাটিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতেছে, এক পায়ের মোজা রক্তে ভিজিয়া রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। “বাবু, আর কোন আশা নাই; কিছু কর্‌তে পারলাম না।” এই বলিয়া সাহেব চক্ষে রুমাল দিলেন ও ‘পাওয়ার হাউস’ হইতে বাহির হইয়া গেলেন!

(৫)

পরদিন দেখা গেল, সাহেব ভোর পাঁচটার সময় আপিসে বাহির হইয়াছেন। যে কয়জন বাঙ্গালী সেখানে ছিল, তাহারা সকলেই সেই রাত্রে প্রবোধের সৎকার করিতে গিয়াছিল। বড়বাবু সাহেবের বাংলায় এক-খানি চিরকুটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে তিনি ভোরে 'ডিউটি' করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের যেন বেলা বারটা পর্য্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়। বোধ হয় সেই নিমিত্ত সাহেব আজ পাঁচটার সময় আপিসে আসিয়াছেন। নিজে কামিজের আস্তিন গুটাইয়া গুদাম হইতে মাল বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন—অন্যান্য সাহেব কর্ম্মচারীরা এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। ছোটসাহেব বেলা আটটা পর্য্যন্ত গত রাত্রের দুর্ঘটনার কোন সংবাদই অবগত ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, বাবুরা যথাসময়ে কর্ম্মে উপস্থিত হইল না, তখন হাজিরা পুস্তকে অনুপস্থিতির চিহ্ন দিয়া রাখিলেন। বড় সাহেব সেদিন গম্ভীর হইয়া রহিলেন। সকালে, খানসামা যখন চায়ের পেয়ালা সম্মুখে হাজির করিল, তখন তিনি হাত নাড়িয়া উঠাইয়া লইয়া যাইবার সঙ্কেত করিলেন।—চা খাইলেন না। অন্যান্য সাহেব, সেদিন তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। অনেকেই অনুমান করিল, বোধ হয় তিনি বিলাত হইতে কোনরূপ দুঃসংবাদের তার পাইয়া থাকিবেন।

বেলা বারটার পর বাঙ্গালীবাবুরা যখন বিষণ্ণবদনে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে আপিসে আসিয়া দেখিল, তাহাদের হাজিরা করা হয় নাই, তখন সে কথা বড় সাহেবকে জ্ঞাত করা হইল। সাহেব রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, —চীৎকার করিয়া বলিলেন, "I see Mr. Jones has no heart at all" এবং পরক্ষণেই খাতা লইয়া হাজিরা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা আজ কেহ কাজ করিও না—প্রবোধের আত্মার মঙ্গলের জন্য

ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, যেন সে স্বর্গে গিয়া সুখী হয়।" তারপর সাহেব আর একটী কথাও বলিলেন না। বাবুরা এতদিন যাঁহাকে নির্ম্মম, নির্দ্দয় বলিয়া জানিত, আজ তাঁহার স্বরূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুদিন পরে সাহেব 'পাওয়ার হাউসে'র দ্বারে একখানি শিলালিপি আঁটিয়া দিলেন। তাহাতে প্রবোধের সৎসাহস, পরোপকারিতা ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় খোদিত ছিল।

ইহার পর সাহেব ক্রমশঃ আরও গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। কাহারও সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিতেন না। অনেক সময় টেবিলের উপর চা জুড়াইয়া যাইত। অনেক দিন হয় ত, চা না খাইয়া আপিসে চলিয়া যাইতেন। বেহারা দেখিত, এক একদিন সাহেব বাসায় আসিয়া পুস্তক পড়িতে পড়িতে সহসা উঠিয়া কক্ষ মধ্যে অনর্থক বিচরণ করিতে-ছেন। একটা ভয়ানক দুর্ভাবনায় যেন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া আছে। আপনা আপনি বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেন—আবার সেই 'পাওয়ার হাউসের' জানালার দিকে গিয়া অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িতেন। কোনদিন বা হঠাৎ "পাওয়ার হাইসে" গিয়া উপস্থিত হইতেন, অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন। এরূপ আচরণে সকলে অবাক্ হইয়া যাইত।

সাহেব একদিন মনে মনে স্থির করিলেন, আমিই বাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছি—এরূপ ভাবনা, কেন যে তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যতদিন যাইতে লাগিল, তত বেশী করিয়া এই চিন্তাই তাঁহাকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি যত এ বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সেখানে থাকা দিন দিন যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। সেই পরিশ্রমী, পরোপকারী যুবকের জন্য

তাঁহার করুণ অন্তর কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই যে, সে দিন ভয়ানক দুর্য্যোগের ভিতর পরের জন্য কত না, ভয়ভীত অন্তঃকরণে তাহার সম্মুখে অনুমতি ভিক্ষা করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে দৃশ্য মনে হইলেই সাহেব ছুটিয়া 'পাওয়ার হাউসে' গিয়া দেখিয়া আসিতেন, যাঁহারা তখন কাজ করিতেন, তাঁহারা কেমন আছেন ?

দুই মাস পরে একদিন শোনা গেল—সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে যাইতেছেন। তাঁহার সমস্ত জিনিসপত্র বাবুদের ভিতর বিলাইয়া দিলেন। কেহই তাঁহার এই সহসা কর্ম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিল না।

বিলাত যাইবার তিন মাস পরে, বড়বাবুর নামে বিলাত হইতে সাহেব রেজেষ্টারী ডাকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিনি তাঁহার অধীনস্থ বাবুদের ৫০০০০৲ হাজার টাকা ও প্রবোধের পরিবারকে ২৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। পত্রের শেষ ছত্রে, তিনি প্রবোধের একখানি ফটোগ্রাফ্ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে, তাঁহার আর কোন সংবাদ কেহ পায় নাই।

পুনর্ব্বরণ।

[১]

সকালবেলা ফুল তুলিতে আসিয়া বৃদ্ধা স্থলোচনা যখন দেখিতেন, বালিকা উমারাণী একমনে শিবপূজা করিতেছে, রাঙ্গা চেলির অভ্যন্তর হইতে তাহার চাঁপা ফুলের মত রংটি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সিক্ত কেশ-রাশি মৃত্তিকাবিলুণ্ঠিত হইতেছে, ললাটের মধ্যভাগে সিন্দূরের টিপ্‌টি নবা-রুণের মত অপরূপ সৌন্দর্য্যে আলোকিত করিয়াছে, তখন স্থলোচনা সেফালি ফুলের গাছের নিকট নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। কুসুমচয়ন ক্ষণ-কালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইত। এত রূপ যে তিনি কাহারও দেখেন নাই —মানুষের এত রূপ কি হয়? বালিকার রূপলাবণ্যে যেন কুসুমসৌন্দর্য্য মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। একাগ্রচিত্তে এ কি সাধনা? জানুর উপর ভর দিয়া, করজোড়ে, নিমীলিতনেত্রে বালিকা হৃদয়ের অকলঙ্ক ভক্তি যাঁহার চরণকমল ধৌত করিতেছিল, তিনি যে দেবতাই হউন না কেন, বালিকার অভিষ্ট সিদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্থলোচনা,উমারাণীর মা স্থরবালাকে, সেদিকে আসিতে দেখিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "দেখ বৌ, যেন সাক্ষাৎ উমা, একবারে তন্ময় হয়ে শিবপূজা করচে। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান যেন তা'র শিবের মত বর জুটিয়ে দেন।"

"তাই বল মা, তাই বল। যে অবস্থা, তাতে যে ওকে সৎপাত্রে দিতে পারব, এমন আশা ত নেই—"

"কিছু ভাবিস্‌নি, দেখবি তখন আমার কথা; বর আপনি খুঁজে এসে যেচে নিয়ে যাবে; এমন সোণার মেয়ের জন্য কি আবার ভাবতে হয়?"

"যে দিনকাল পড়েছে, টাকা নইলে কি বিয়ে হয়? কষ্টেস্থষ্টে

কোনও রকমে দিন গুজরাণ হচ্ছে,তাত দেখ্‌ছ ? দুমাস অসুখে ভুগ্‌লেন। একটী পয়সা মাইনে পান নাই। ধারধোর করে চল্‌চে, তার উপর উমারিও বিয়ের সময় হয়েছে, অমন বয়সে, অনেক মেয়ে শ্বশুরঘর করে। কি যে হবে, ভেবে পাই না।” বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুলোচনা ফুল তুলিতে তুলিতে বলিলেন—

“অত ভাবিস্‌নি, বৌ, অত ভাবিস্‌নি! আমার উমার মত সুন্দরী মেয়ে সাতখান গাঁ ঘুরলেও পাওয়া যাবে না। আমার বাপেদেরও অবস্থা খুব মন্দ ছিল, কিন্তু পাড়ার সবাই বল্‌ত, অমন মেয়ের বিয়ের ভাবনা? ঠিক তাই হ’ল। যারা দেখ্‌তে এলেন, একবারে পছন্দ করে গেলেন। তোমার ঠাকুরদাদা আজও আমাকে খোঁটা দিয়ে বলেন, অত সুন্দর হতে হয় যে, একটা পয়সাও দাবী করা গেল না”

সুলোচনা এইরূপে আত্মপ্রশংসার লোভটা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিতে বলিতে তাঁহার বিশীর্ণ, শিথিলচর্ম্ম বদনমণ্ডল অল্প রক্তাভ হইল, কোটরগত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল দেখাইল।

এই সময় উমারাণী পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মা ও সুলোচনা ঠাকুরাণী দুইজনে কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের কোনও কথাই এতক্ষণ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সে উভয়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। উমা প্রতিদিন পূজা শেষ করিয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ করিত।

সুলোচনা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “মনের মত বর মিলুক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্।”

উমা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। সুলোচনা এত বক্তৃতার পর যে, কেবল ফুল লইয়া ফিরিলেন তাহা নয়, তাহাদের উঠানে যে লাউ গাছ হইয়াছিল, তাহার দুইটি কচি ডগাও লইয়া গেলেন।

(২)

উমারাণীর বিবাহের জন্য সুরবালা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বারং-বার স্বামীকে পাত্রান্বেষণ করিবার জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না।"

সূর্য্যকান্ত সহধর্ম্মিণীর কথায় সত্য সত্যই সেদিন চিন্তিত হইলেন; কিন্তু উপায় কি, মনে মনে বলিলেন, মুখে বলিলে বা ধর্ম্মের দোহাই দিলেই ত বিবাহ হইয়া যাইবে না? তাহার উপর আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। কেমন করিয়া তিনি উমারাণীকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন, কেমন করিয়াই বা অর্থসংগ্রহ হইবে!

তিনি কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া উমারাণী তরকারী কুটিতেছিলেন। সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। দুর্ভাবনায় ও সমাজের আশঙ্কায় তাঁহার মুখ বিশীর্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যকান্ত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অর্থের বল নাই যে এখনই একটী পাত্র সংগ্রহ করে বিবাহ দি। এমন বিষয় সম্পত্তিও নাই যে, বিক্রয় করিলে টাকা যোগাড় হ'তে পারে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তবেই, নতুবা আর কিছু উপায় দেখ্‌ছি না"

সুরবালা বলিলেন, "ভগবান ভিন্ন কোনও ভরসা নাই জানি, কিন্তু তিনিও কি বিমুখ হলেন? তুমি চারদিকে খবর দাও, পাত্রের সন্ধান কর, চেষ্টা কর, তা হ'লে অবশ্য তাঁর দয়া হবে।"

এই সময় গ্রামের ঠাকুরদাদা হারাণবাঁড়ুর্য্যে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উমারাণী শশব্যস্তে বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া বলিল, "বাবাকে ডাকিয়া দিব কি?"

"হাঁ রে শালী হাঁ—তোরা ত আর আজকাল বুড়া ঠাকুরদাদাকে

'ধোম্‌লাস' না। টেরি-কাটা, চশমা-আঁটা, ছোকরা বর, না হলে মুখ ভার করে বসে থাকিস্। পাকা চুল দেখ্‌লেই 'আঁত্‌কে' উঠিস্; মনে করিস, বুড়োগুলোর নামে 'ওয়ারেণ্ট জারি হয়েছে, কোন্ দিন কখন ধরা পড়বে, আর চলে যাবে। আলাপ করে কোন লাভ নেই। কেমন কি না বল?"

"কেন ঠাকুরদাদা, একথা বলছ? কবে বল তোমার মান্য করি নাই?"

"তুই শালী করিস্ বলেই ত তোর জন্য এত মাথাব্যথা। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় তুই আমাকেই তোর বর পছন্দ করেছিলি। তখন কি আর ভেবেছিলি যে, তোর বের বয়সে ঠাকুরদাদার মাথার চুল বরফের কত শাদা হয়ে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, লাঠি নইলে এক পা চলতে পারবে না।"

উমারাণীর মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। সে তার শৈশবকে মনে মনে এরূপ অন্যায় প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য অপরাধী করিল।

"কি রে শালী? চুপ করে রইলি যে; ভাবচিস্ পাছে সত্যপালন করতে হয়। তা ভয় নেই, তুই পারলেও আমি রাখতে পারব না।

এই সময় সূর্য্যকান্ত বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এই যে হারাণ খুড়ো— আপনার কাছে যাব মনে কর্‌ছিলাম তা, আপনি এসে হাজির হয়েছেন। বেশ ভালই হয়েছে। উমা, তোর ঠাকুরদাদার জন্য এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

একথা, সে কথার পর তামাক খাইতে খাইতে হারাণবাবু বলিলেন, "আমি যা'র কথা বলচি, সে ছেলেটি বেশ। লেখাপড়ায় যেমন, বিষয়-সম্পত্তিও তেমন। আমি যখন পশ্চিমে কর্ম্ম কর্ত্তাম, তখন ছেলেটির পিতার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। চিঠিপত্র লেখালেখি বরাবরই আছে। তবে কি জান, এখন ছুটোছুটি করে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করবার মত শক্তি নাই

বলেই, আসা যাওয়া বন্ধ। তাঁর পুত্রের জন্য আমাকে একটী সুন্দরী মেয়ের কথা লিখেছেন। তাঁরা খুব বড় লোক—বেশ বাড়ী ঘরদোর; কিছুরই অভাব নাই, ছেলেটিও এম, এ, পাস করেছে। আমাদের উমারাণীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে সহজে মিলবে বোলে বোধ হয় না। কি বল?”

কপাটের আড়ালে ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া সুরবালা মনোযোগ সহকারে কথোপকথন শুনিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া দুরাশা মনে হইলেও, আনন্দে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শিকল নাড়িয়া তিনি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সূর্য্যকান্ত মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “তাঁহারা কি আমাদের ঘরের মেয়ে নেবেন? তাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মত আমার শক্তি কই বলুন?”

“কেন শক্তি নেই বল? তাঁরা চান সুন্দরী মেয়ে। সে ক্ষেত্রে উমারাণীর সমকক্ষ একটী মেয়ে পাওয়া বড় ভাগ্‌গির কথা,—কোথা গেল শালী? এখন আর আমাকে মনে ধরে না। সেই জন্যই এত ভাবনা, নইলে কি এমন মেয়ে বাড়ীর বাহিরে যেতে দি। ছেলেবেলায় দুবেলা শালী আমাকে বে করত আমার বর বলে পথ চল্‌তে দিত না।”

“তাঁরা কি রাজি হবেন? এম, এ পাশ করা ছেলে! বড় লোক, অনেক টাকা হাঁকবেন, তখন?”

“তখন, সে ভার আমার? তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা ত রাজি!”

“আপনার ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আমাদের আর অমত কি।”

এই সময় উমারাণী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, সেখানে আসিয়া

উপস্থিত হইল। ফুৎকারের পরিশ্রমে মুখে রক্ত জমিয়াছিল, উদ্দীপ্ত অগ্নির আভা লাগিয়া মুখখানি গলিত স্বর্ণের ন্যায় আরক্তিম দেখাইল। ঠাকুরদাদা সেই মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেরে শালী দে, আর ফুঁ দিতে হবে না। মুখখানা যে একবারে সিঁদুরের মত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।" উমারাণী সলজ্জনয়নে ধীরে ধীরে সেখান হইতে পলাইল। সূর্য্যকান্ত হাসিতে লাগিলেন।

[৩]

অনেক সমৃদ্ধিশালী বংশ টাকার পরিবর্ত্তে সুন্দর মেয়েরই অনুসন্ধান করেন। এক্ষেত্রে তাহাই হইল, যথারীতি কন্যা দেখা হইয়া গেল। উমারাণীর সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমোহিত হইলেন। শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই আশাতীত সংঘটনে সূর্য্যকান্ত ও সুরবালার আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহাদের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কারাদি ছিল,—এই আনন্দ-উৎসবে তাহার সমস্তই নিঃশেষিত হইল। হর্ষবিভোর পিতামাতা দরিদ্রের গৃহে সম্ভাবিত সকল ত্রুটীগুলি, কাঙ্গালের পূজার অর্ঘ্যের মত তাঁহাদের অনাবিল অজস্র স্নেহ ও ভাল-বাসা দিয়া পূরণ করিয়া দিলেন। সুলোচনা ঠান্‌দিদি, বহুদিন পরে তাঁর পুরাতন বেনারসী শাড়ীখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া অলঙ্কারগুলি মাজিয়া ঘসিয়া পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাসরে বিস্তর রসিকতা করিতে কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু ইংরাজি বিদ্যাপারদর্শী, বক্তৃতাবিজয়ী, ইংরাজি-রসরসিক, সেদিন, সে আসরে দুইটী ঠোঁট বড় এক করিতে পারেন নাই।

ঠান্‌দিদি সেদিন সুরবালাকে সতীবাক্যের তেজটা হাতে হাতে দেখাইয়া বলিলেন, "ও বৌ, বর যে আপনি এসে জুটিল?" সুরবালা সে কথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। বাসরের দ্বারে লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে হারাণঠাকুরদাদা

উঁকি মারিলেন। বুড়ার স্বল্পদন্ত মুখে হাসি ধরে না। একছড়া ফুলের মালা হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন; বলিলেন, "কই রে শালী, একবারে যে বরের কোলটির ভেতর গিয়া লুকিয়েছিস্। পালালে ছাড়ব না কি! সেই এক বছরের বেলা থেকে ভরসা দিয়ে আসচিস্। আর আজ যুবা, পাসকরা-বর পে'য়েই বরখাস্ত কর্‌লে চলবে না—আয় শালী, আজ মালাটা বদল করে দখলী স্বত্ব বজায় রাখি।"

উমারাণী লাল চেলীখানি দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া এক পাশে পড়িয়াছিল, লজ্জায় যেন সে আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল, বর-কনে উভয়েই তখন তাঁহাকে প্রণাম করিল। ঠাকুরদাদা মালাছড়াটি উমারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দে শালী, আমার সামনে তোর বরের গলায় পরিয়ে দে।" উমারাণীর অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু সকলের পীড়াপীড়িতে, সে ধীরে ধীরে লজ্জাভারপীড়িত নতনয়নে ও অনুরাগভয়কম্পিত হস্তে মালাটি স্বামী শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, তাহা মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। আশঙ্কায় সে যেন জড়সড় হইয়া উঠিল।

(৪)

তারপর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বহু সাধাসাধনায় মাত্র দুই বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। তাঁহারা বড়লোক; কিন্তু শ্বশুর অবস্থাপন্ন লোক ন'ন। তাঁহারা যশ, সম্মান ও ঐশ্বর্য্যেরই মর্য্যাদা বুঝেন। বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহে আচ্ছন্ন। সরল আন্তরিকতা, প্রাণস্পর্শী স্নেহ ও ভালবাসার বড় একটা ধার ধারেন না। দরিদ্র সূর্য্যকান্তের পর্ণকুটীরে যে কোহিনূরসদৃশ অমূল্য প্রীতি, অকলঙ্ক ভালবাসা ও সহানুভূতি বিরাজিত, শত মণিমাণিক্যের উজ্জ্বলতা যে সেখানে

নিষ্প্রভ—তাহা শরৎচন্দ্র মোটেই অনুভব করিতে পারিল না। দরিদ্রের গৃহে পুনঃ পুনঃ আসিতে, যেন তাঁহার মস্তক সরমে সঙ্কোচে নত হইয়া যাইত।

শরৎচন্দ্র অন্বেষণ করিয়াছিল সুন্দরী স্ত্রী, তাহা ত পাইয়াছে। সুতরাং তাঁহার শ্বশুরালয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিল না।

শ্বশুরশাশুড়ীর প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারা যে জামাতাকে পুত্র অপেক্ষা স্নেহ করেন, জামাতার ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসায় যে তাঁহারা গৌরব অনুভব করিয়া সুখ ও সন্তোষ লাভ করেন, তাহা এই ধনী পরিবার মোটেই বুঝিতে পারিত না। তাঁহাদের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর না হইলেও, ভগবান যে এই দরিদ্রপরিবারকে সমান অন্তঃকরণ ও স্নেহমমতা দয়াধর্ম্ম বুঝিবার মত প্রাণ দিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে ভগবানের করুণা লাভে বঞ্চিত নন, এতটা কথা ভাবিবার বোধ হয় শরৎচন্দ্রের অবসর ছিল না। এই শ্রেণীর জীবগুলি মনে করেন, জগতে কোনও গতিকে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট। ইঁহারা পৃথিবীর কোনও একটী বিশেষ কাজে মোটেই স্থান পান না। কেবল সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এমন একটা ব্যর্থ-জীবন যাহারা ক্রমাগত অনর্থক টানিতে থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মূঢ় বোধ হয় আর কেহই নাই। সূর্য্যকান্ত যখন জামাতাকে তাঁহাদের পর্ণকুটীরে আহ্বান করিতে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন, তখন সব চেয়ে তাহাদের অবস্থাটি শরৎচন্দ্রের চক্ষে হাস্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এইরূপ অকরুণ ব্যবহার তাঁহাদের মনে সীমাহীন অশান্তি সৃষ্টি করিত। কন্যা উমারাণীর নিকট ঘূণাক্ষরে এ সকল কথা বা এমন কোন ভাবই তাঁহারা কোনদিন প্রকাশ করিতেন

না, পাছে উমারাণী মনে কষ্ট পায়। সমুদ্রের সহিত নদীর মিলনের মত, কেবল নদীই ছুটিয়া সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিল, সাগর তাহার অসীমত্ব লইয়া কোনদিন ফিরিয়াও চাহিল না। এই সকল ধনী পরিবারের সহিত সূর্য্যকান্তের কুটুম্বিতার পরিণাম ঠিক এইরূপই হইল। আষাঢ়ের দিনে বৃষ্টিহীন মেঘগুলি কেবল কৃষককে উপহাস করিয়া উড়িয়া গেল,—কৃষক নিরুপায়ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে মেঘের প্রতি চাহিয়া কেবল হতাশ হইল।

(৫)

উমারাণী কিছুতেই এই ধনী-পরিবারের মধ্যে আপনাকে খাপ্ খাওয়াইতে পারিল না। তাহার সকরুণ সদ্ব্যবহারগুলি, ইঁহাদের চক্ষে মোটেই ভাল লাগিত না। উমারাণীর লজ্জানম্র প্রকৃতি বড়লোকের সংসারে তাহার দীনতাই প্রকাশ করিত। সে জন্য বেচারী বড়ই 'কোণঠাসা' হইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র একদিন একখানি 'ফাষ্টবুক' কিনিয়া আনিল এবং উমাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ এতটা বয়স তোমার বৃথা নষ্ট হয়েছে। তুমি লেখাপড়া কিছুই শেখ নাই। এখন হ'তে তোমাকে পড়াশুনা করতে হবে।" উমারাণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল; সমস্ত প্রকৃতিই বুঝি তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। শরৎচন্দ্র ভাবিয়াছিল, উমা নিশ্চয়ই এ প্রস্তাবে নিজের অভাবের বিষয় অনুভব করিয়া পড়িবার জন্য খুব একটা উৎসাহ প্রকাশ করিবে; কিন্তু উমা যখন ইংরাজি বইখানি কম্পিতহস্তে তুলিয়া দুই একবার পাতা উল্টাইয়া নতনয়নে নিরুত্তর হইয়া রহিল, তখন শরৎচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "আজ দুপুর বেলা তোমাকে পড়াব?"

উমা সরমপীড়িতনয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি দিনের বেলা এসে পড়তে পারব না।"

"কেন? দিনের বেলা এলে কি খেয়ে ফেলব।"

"সকলে কি মনে করবেন?"

"কি মনে করবে? স্বামীর নিকট লেখাপড়া শিখছ্ ভাল কথাই ত!"

উমারাণী নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তর্ক করা তার স্বভাব নয়।

শরৎচন্দ্র খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমাকে এখানে কিছু বাপের বাড়ীর মত রান্না বা অন্য কোন কাজ করতে হয় না। শুধু ইংরাজি শিখলেই হবে না, হারমোনিয়ম, পিওনো প্রভৃতি বাজাতে শিখতে হ'বে। ঐ পাড়াগেঁয়ে ধরণের কাপড়গুলা আমার চক্ষের শূল। ও সব তোমার বাপের বাড়ী গিয়া পরো।"

এবার বাপের বাড়ী কথাটির উপর শরৎচন্দ্র খুব জোর দিয়া বলিল।

বাপের বাড়ীর তুলনায় উমারাণীর আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগল। সে কোনদিন কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতে শেখে নাই, সুতরাং সেদিনও করিল না। মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চখের জল মুছিল।

শরৎচন্দ্র বলিলেন "দেখ আমাদের কুটুম্বসাক্ষাত সব বড়লোক। তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা কেমন শিক্ষিত, সুসভ্য। এসব না শিখলে, কেমন করে তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় ও মেলেমেশা করতে পারবে?" স্বর একটু মিষ্ট করিয়া বলিল "দিনের বেলায় যদি লজ্জা করে, না হয় রাত্রে পড়িবে, কেমন?"

উমারাণী কাতরতাপীড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল "ইংরাজী না শিখলে কি চলবে না? বাজনা আমি কিছুতেই বাজাতে পারব না। আমাকে এ সব থেকে রক্ষা কর!"

"যদি আমার নিকট পড়তে লজ্জা করে, তবে একজন মেম-সাহেব না হয় রেখে দেব, তা হ'লে তোমার আপত্তি হবে না, কেমন?" মেম-সাহেবের নামে উমা শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে বাঘ দেখিলেও বোধ হয় সে এতটা ভীত হইত না।

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হইয়া বসিল, আর কোন কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া উমারাণী ধীরে ধীরে বলিল "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ওসব শিখ্‌তে পারব না।"

শরৎচন্দ্র তীব্রস্বরে বলিল, "তবে কি পারবে?"

"আমি তোমার জন্যে রোজ-রোজ নূতন খাবার তৈরি করব। রান্না করব। আর যা বল, সব করতে রাজি আছি।" শুনিয়া শরৎচন্দ্র বিনা উত্তরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। এই আচরণে উমারাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ফার্ষ্ট বুক খানির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে নানা চিন্তার স্রোত বহিল। কি করি? আমি ত তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তবু তিনি আমাকে বুঝিতে পারেন না? ইংরাজি পড়িতে পারিলেই কি ভালবাসা হয়? পিওনো বাজাইতে পারিলেই কি, ভদ্রসমাজে মিশিতে পারে?

তারপর তার পিতামাতার মুখ মনে পড়িল, তাঁহাদের প্রতি ইঁহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিতে উমার বড় অপমান বোধ হইল। তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। অভিমানে বালিকার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে নিজে নিজেই বলিল "কিছুতেই আমি শিখ্‌ব না। যাহা আমার ভাল লাগে না, প্রতারণা করে, তাহা ভাল লাগে এমন কথা কোন দিনই স্বীকার করব না।" তারপর ধীরে ধীরে যেখানে দাসদাসী আহারাদি করিতেছিল সেখানে গিয়া উপবেশন করিল। তাহাদের সুখদুঃখের অনেক গল্প শুনিল। তখন বেলা অনেক হইয়াছিল।

আকাশে দুইএকখানি লঘু মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে, ফেরিওয়ালা চীৎকার করিয়া ফিরিতেছিল। কলতলায়, দুর্ব্বল শেওলাগুলি রৌদ্রে শুষ্ক হইয়াও মাথা তুলিবার অবকাশ লাভ করিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেগুলি, যাহারা এখনও স্কুলে যাইবার মত বড় হয় নাই, কয়েকটি লোহার চাকা লইয়া পথে খেলিতেছিল এবং কথার অবাধ্যতার জন্য সেগুলিকে লাঠি দ্বারা নিদারুণ ভাবে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছিল। কখনও কখনও চাকাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিতেছিল, শিশুগুলি উল্লাসে তাহাদের পশ্চাতে করতালি দিয়া নাচিতেছিল। উমা দেখিল, উহাদের এই খেলার ভিতর কেহত বাধা দিতেছে না—ইহাদের আনন্দের সীমা নাই—বড় লোকের ছেলের খেলা ও গরীবের ছেলের খেলার বিশেষ কোন বিভিন্নতা নাই!

(৬)

উমারাণীর পিতা কন্যাকে দেখিতে প্রথম প্রথম কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের অকরুণ ও অনাদর আচরণ অবলোকন করিয়া কুটুম্ববাড়ী অধুনা বড় আসিতেন না। ইঁহারাও বধূকে বড় কেন, মোটেই পাঠাইতেন না। উমারাণী বুদ্ধিমতী, এ সব যে বুঝিত না তাহা নয়। ইঁহাদের সংসারে আপনাকে সে কিছুতেই মিশাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সরু সেলাইয়ের নিকট অশিক্ষিত হাতের মোটা সেলাইয়ের মত সে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিত। শরৎচন্দ্রকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। গৃহকর্ম্ম সমস্তই নিজ হাতে করিত, কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাহার মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান, দিন দিন মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। শরৎচন্দ্র আজ কাল বড় ভাল করিয়া উমার সহিত কথা বলিত না, অনেক সময় গম্ভীর হইয়া পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিত। উমারাণী মনে করিত এরূপ আচরণ, হয়ত বড় মানুষের খুব স্বাভাবিক। এখন নিকটে যাইলে, বোধ হয় রাগ করিতে পারেন। গৃহের মধ্যে অনিমিত্ত কারণে, এটা সেটা নাড়িয়া ভয়ে ভয়ে

সন্তর্পণে পানের ডিবাটি স্বামীর নিকট রাখিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইত। কোন দিন হয়ত খাবারের রেকাবীখানি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন দেখিত শরৎচন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তখন সে রেকাবীখানি সেখানে রাখিয়া অভিমান ভরে প্রস্থান করিত। চক্ষের কোণে জল উছলিয়া উঠিত। শরৎচন্দ্র মনে করিত, এরূপ করিয়া থাকিলে, উমা ক্রমে বাধ্য হইয়া লেখাপড়া শিখিতে সম্মত হইবে। পাড়াগায়ের ভাবগুলিও পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন দিন, উমা মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া সাহসে ভর দিয়া সে স্বামীর নিকট, স্ত্রীর প্রাপ্য মর্য্যাদা আদায় করিবার জন্য অগ্রসর হইত, কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া পড়িত, তখন উমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাহার আর অগ্রসর হওয়া হইত না ; অভিমানে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে পূজার আয়োজন করিত, কিন্তু দেবতার উগ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার পূজা করা হইত না। স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই তাহার হৃদয়ের এক মাত্র বাসন ; আপনার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া সে যখন নিজে কাঙ্গালের মত কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইত, তখন ইংরাজীবিদ্যাপারদর্শী, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত শরৎচন্দ্র যে কিছু অনুভব করিতে পারিত, তাহা বোধ হয় না। উমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় ও পবিত্রমূর্ত্তি সে দেখিতে পাইত না। উমা বড় কথা বলিত না। কথা বলিতে তাহার শঙ্কা হইত, সরমও হইত। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ব্যবধান দূর হইল না।

(৭)

আজ দুইমাস লইল উমারাণী পিত্রালয়ে গিয়াছে। খেলার ইঞ্জিন ও মোটর গাড়ীগুলিকে দম দিয়া দিলে, সেগুলি যেমন অনবরত চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, সে দিন সকাল হইতে দাসদাসীগুলি মনিবের আদেশে অনাদেশে কেবল ছুটাছুটি করিতেছিল। বৈঠকখানা গৃহটি সাধারণ

সাজসজ্জার উপর কিছু বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল; রন্ধনাদির বিশেষ আয়োজন চলিতেছিল। সকলেই চুপি চুপি, কাণে কাণে কথা বলাবলি করিতেছিল; শরৎবাবুর আবার বিবাহ. দাসদাসীগুলি গণ্ডস্থলে হস্তার্পন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিল। এরূপ আচরণটা যে অন্যায় সে কথা তাহারা প্রকাশ করিতে সাহস না পাইলেও মনে মনে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না। একজন বলিল, "মাঠাকরুণ কর্ত্তা-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল যে মেয়েটি কত বড়—তা কর্ত্তাবাবু বল্লেন, দুটো পাস করা। আঠারো বছর বয়স। বেশ গানটান গাহিতে পারে। শরৎ যেমন চায়, ঠিক মনের মত হবে।" একজন বলিল "বলিস্ কিগো?" আর একজন বলিল "বল্‌বার আর কিছু নেই গো, বড়মানুষদের এমন নাকি আজকাল হয়।"

"এ্যা, হয়? "বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া অজস্র হাসিতে লাগিল।

একজন বলিল "হাসিস্ নি দেখ্‌তে পেলে সর্ব্বনাশ হবে।"

ইহারপর যথাসময় পাত্র দেখা হইয়া গেল। পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিয়া আসিলেন। এবার কুটুম্ব বড়লোক হইবেন। যাহাদের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল তাহার চির দিনই পশ্চিমে থাকিতেন। পূর্ব্বের বিবাহের বিষয় বোধ হয় তাঁহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। সূর্য্যকান্ত যথাসময়ে এ সংবাদ পাইলেন। ভাবিয়া কোন উপায় দেখিলেন না। হারাণখুড়ার নিকট গিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "আমি সব খবর রাখি। তুমি ভাবিও না।" বিবাহের দুই চারি দিন থাকিতে, হারাণখুড়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, বড় মজা হইয়া গিয়াছে। যে মেয়েটির সহিত শরতের বিবাহ ঠিক হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে, অনিল যখন বিলাতে সিভিল সারভিস অধ্যয়ন করিতে যায়, তখন

এই মেয়েটিরই পিতার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার কথা ধার্য্য হয়। এখন ছেলেটি পাশ করিয়া গত পরশ্ব তারিখে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর মেয়েটির পিতা কোন রূপে শরতের পূর্ব্ব বিবাহের কথা অবগত হইয়াছেন। তিনি এই অন্যায় আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য সিভিল সারভিস পাস-করা ছেলেটির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে। এই দেখ আমার নিমন্ত্রণ চিঠি আসিয়াছে। এঁরা শরতদের অপেক্ষ খুব বড় লোক। তাহার উপর শরতের সহিত অনিলের তুলনা কোন দিক থেকে হয় না। মেয়েটি শিক্ষিত, সেও অনিলের সহিত আপনার বিবাহে মত দিয়াছে। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সুরবালা আকাশে দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ঠিক সেই সময় উমারাণীর শ্বশুরালয় হইতে ঝি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। উমারাণীকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শরতের পিতা সূর্য্যকান্তও অনুনয় করিয়া বৈবাহিক পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্র দিয়া ঝি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল।

অজ্ঞাতবাস।

(১)

পক্ককেশ লোলচর্ম্ম রামদুলালবাবু সে দিন সকাল বেলা তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন "দেখ গিন্নী, কাজটা ভাল হলো না।"

গিন্নী উমাশশী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া একটি বালতিতে একতাল গোবর মিশাইয়া উঠানের চতুর্দ্দিকে ছড়া দিতেছিলেন—দাসদাসী সত্ত্বেও এ কাজ প্রতিদিন তিনিই করিতেন। স্বামীর অনুযোগ শুনিয়া তিনি সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "কেন কাজটা ভাল হ'লো না! একরত্তি মেয়ে, না হয় কটা চামড়াই আছে, তা বলে এত অহঙ্কার যে শ্বাশুড়ীকে শ্বাশুড়ী বলে জ্ঞান নেই, একেবারেই বিয়ের ক'নে ঘরের গিন্নী হ'য়ে বসতে চায়? মাথা নীচু করতে বুঝি অপমান বোধ হলো; অমন বৌ আমি কিছুতেই ঘরে আনব না।"

পল্লিবালিকা রাধারাণী এই সকল অভিযোগের কোনটীরই আসামী নহে। বালিকা প্রথমে শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়া এবং কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর শিক্ষিত মহিলাসমাজের সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনার অসামঞ্জস্য অবলোকন করিয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। মা বলিয়া দিয়াছিলেন, যে সর্ব্বাগ্রে শ্বশুরশ্বাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিবে, কিন্তু রাধারাণী প্রথমে শ্বাশুড়ী চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন এক আত্মীয়াকে শ্বাশুড়ী জ্ঞানে, সরল বিশ্বাসে প্রণাম করে, ইহাতে নাকি উমাশশী হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। তার-পর নানাকাজে তিনি ব্যস্ত হইয়া বেড়ান সুতরাং পুত্রবধূর প্রাপ্য প্রণামটা যখন প্রথম হইতেই তাঁহার পাওয়া হইল না, তখন তিনি ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। মুখখানি কালমেঘের মত গম্ভীর হইয়া রহিল। মাঝে মাঝে

দাসদাসীদের উপর অকারণ জলদগম্ভীরস্বরে ভীষণ গর্জ্জন চলিতে লাগিল। আনন্দের দিনে, উৎসবের মাঝে উমাশশীর এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কেহ কেহ বৌ মনে ধরে নাই, এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন, গহনাগুলি মোটেই ভাল হয় নাই, সোনাটা মরা-সোনা বলিয়া অনুমান হইতেছে, এ প্রকার সমালোচনাও অপ্রকাশ রহিল না। গিন্নী বধূমাতার অনেকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ অন্বেষণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন। সে গুলিকে অবলম্বন করিয়া পুত্র সত্যেন্দ্রকে বলিলেন "দেখ সতু, তুমি আমার তেমন ছেলে নও, চিরদিন আমায় মান্নি করে এসেচ। তোমাকে বলছি, এ বৌ আমাদের সংসারের সুলক্ষণ নয়, তোমার আবার বিবাহ দিব।"

সত্যেন্দ্র তখন কলেজে পড়িতেছিল। ইংরাজিশিক্ষা করিলে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না, এমন একটা সংস্কার তাহার মাথার মধ্যে অনেক দিন হইতে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং সে এই অযথা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বা কারণ অনুসন্ধান করিল না, যাহার বিপক্ষে এ অভিযোগ তখন তাহার সহিতও সত্যেন্দ্রের কোনও প্রকার পরিচয় ঘটে নাই। অতএব এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রলোভনে সে অম্লান-বদনে উত্তর করিল "তার আর কি?"

নববধূ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝিল না। বাপের বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গেই তাহার কথাবার্ত্তা, অপরকে দেখিলেই সে তৎক্ষণাৎ মাথার কাপড় টানিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। প্রতিবেশীদিগের কন্যা ও বধূগণ যখন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে ও সহস্র প্রশ্ন করে, সে কি কি বই পড়িয়াছে? শকুন্তলা ও সীতাচরিত্রের মধ্যে কতটা তফাৎ, সূর্য্যমুখীর স্বামিপ্রেম ও কুন্দনন্দিনীর ভালবাসা কোন্‌টা আদর্শ? রবিবাবুর কবিতা-গুলি তাহার কেমন লাগে? শেলির সহিত রবিবাবুর তুলনা করিলে

তাহার মতে কে বড় ? এমন সকল বড় বড় প্রশ্নই তাহারা জিজ্ঞাসা করে, আর রাধারাণীর মাথা ঘুরিতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া আসে, আশঙ্কায় তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠে, মনে হয় ইঁহাদের সংসর্গ এখনই ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া সে তাহাদের পল্লী-কুটীরে ফিরিয়া গিয়া হাঁপ্ ছাড়ে। মাতা তাহাকে এ সব কথা কিছুই শেখায় নাই। সকালে শয্যাত্যাগ, ঠাকুরের একশ আটনাম জপ, গুরুজনের পদধূলি গ্রহণ সে ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল। সংসারের কায কর্ম্ম করা, ইহার উপর কোন্ তরকারীতে কোন্ কোন্ আনাজ প্রয়োজন এবং কোন্ কোন্ তরকারীতে কোন্ বাঁটনা দিলে ভাল হয় এ গুলিই সে খুব ভাল জানিত ; সুতরাং এ বিষয় কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইতে পারিবে না এ বিশ্বাস রাধারাণীর ছিল। কিন্তু এ সভা সহরাঞ্চলে সে সকল কথার কোন আলোচনাই সে দেখিল না। এখানে ও সব কাজ মস্তকের অগ্রভাগ মুণ্ডিত, পশ্চাতে ঝুটিবাঁধা উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত। রাধারাণী ঝিয়ের কাণে কাণে বলিল "কবে আমাদের যাওয়া হবে ?" ঝি এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "কেন দিদি কষ্ট হচ্চে ?"

"হাঁ" বলিয়া রাধারাণী ঝিয়ের বুকে মুখ লুকাইল।

ঝি বলিল "এই ঘর যে তোমাকে বারমাস করতে হবে। এ যে এখন তোমার নিজের ঘর দিদি।" রাধারাণী কোনও উত্তর দিল না। অঞ্চলের খুঁট অঙ্গুলিতে জড়াইতে লাগিল।

যাইবার সময় রাধারাণী শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেল, শ্বাশুড়ী পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ হ'য়েছে।" রাধারাণী ভয়-বিহ্বল-নয়নে শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে একবার চাহিল, দেখিল সে মুখ গম্ভীর।

বিয়ের কনে যথারীতি তিনদিন পরে চলিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া রাধারাণীর মুখে হাসি বাহির হইল।

(২)

তাহার পর অনেকগুলি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু রাধারাণীর শ্বশুরঘর করা হয় নাই। শ্বশুরালয় হইতে কেহই তাহাকে আনিতে গেল না। রাধারাণীর পিতা যতীন্দ্রবাবু যে সব তত্ত্ব করিলেন, সে গুলিও অবমানিত হইয়া ফেরত আসিল। রাধারাণীর পিতা মফঃস্বলে ওকালতী করিতেন। পূজা ও বড়দিনের বন্ধে জামাতাকে লইতে কয়েকবার কলিকাতা আসিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শেষবার কলেজে গিয়া জামাতা সত্যেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কলেজ বন্ধ হইতে তখনও দুই তিন দিন অবশিষ্ট ছিল।

তিনি বলিলেন "বাবাজি এবার ছুটিতে আমাদের ওখানে যেতে হবে, বিবাহের পর ত আর তোমার যাবার সুবিধা ঘটে নাই, বাড়ীতে বড়ই দুঃখ করে।"

সত্যেন্দ্র অবনতমস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনর্থক জুতার অগ্রভাগ দিয়া মৃত্তিকাস্থিত একখানি পাথরকে বৃথা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

"কি বল ?"

"আজ্ঞে।"

'তাহ'লে আজই আমার সঙ্গে চল। এখন ত বন্ধের মুখ, বোধ হয় পড়াশুনার তেমন বিশেষ ক্ষতি হবে না; কি বল ?"

"কলেজ বন্ধ হ'তে আর দুদিন বাকি, বৃথা কেন পারসেণ্টেজটা কমাই।"

"তবে না হয় দুদিন অপেক্ষা করি, কি বল ?"

"বাবাকে কি বলেছেন ?"

"তাঁহাকে ত অনেকবারই বলেছি, তিনি রাজি হন, কিন্তু বেনঠাকুরুণ মত দেন কৈ।"

' সত্যেন্দ্র পকেট হইতে একটি পেন্সিল বাহির করিয়া দাঁতের মধ্যে বারবার চাপিতে লাগিল। সত্যেন্দ্রের সহপাঠী দুই একজন যাহারা বাহিরে আসিতেছিল, তাহারা উপহাস করিয়া বলিল "কি হে আবার বিয়ের সম্বন্ধ চলচে না কি, বেশ বাবা! এ রকম করে টাকা রোজগার করা মন্দ নয়।" সত্যেন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাইলে তাহারা বুঝিল লোকটী ঘটক নয়, কোন বিশিষ্ট আত্মীয় হইবে। তখন জিভ কাটিয়া "Beg your pardon" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহাদের কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবুর বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমস্ত অন্ধকার দেখিলেন। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন "দেখ বাবাজি, পিতামাতার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য; সে বিষয়ে আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। তবে একটা কথা বলি, তুমি লেখাপড়া শিখেচ নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নাই। কিন্তু যাকে বিবাহ করেছ তার প্রতিও কি একটা কর্ত্তব্য নাই। তা'র ভালমন্দ দেখা তোমার উচিত নয়? আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হ'য়েছে নানারূপ অছিলা আপত্তি করে এতদিন কেটেছে, আর কি ভাল দেখায়?"

সত্যেন্দ্র শূন্যদৃষ্টিতে একবার সম্মুখের পথের দিকে চাহিল, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া কলেজের দিকে তাকাইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "তবে এখন আসি? বাবাজি মনে করচ তুমি স্বাধীন নও, তবে কি আমার মেয়েটি স্বাধীন হবে? দুঃখে ক্রোধে ঘৃণায় তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে

বাহির হইয়া পড়িলেন। সত্যেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে ক্লাসে গিয়া বসিল।

(৩)

অনেক চেষ্টা করিয়াও সত্যেন্দ্র বি এ পাশ করিতে পারিল না। উমাশশী একদিন বলিলেন "দেখ সতু, তোর শ্বশুর ত কোন খোঁজখবর মোটেই নিলে না, তোর আর একটা বিয়ে দি। বৌ না হ'লে, বাড়ী যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্ছে।"

সত্যেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। আলমারী হইতে অকারণ একখানি বই খুঁজিতে ব্যস্ততা দেখাইল। উমাশশী পুত্রের পরিত্যক্ত জামাকাপড় গুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন "বৌ না হ'লে আর ভাল দেখায় না, লোক বড় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কর্ত্তা মারা যাবার পর থেকে বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করচে, আমি একলা টেঁকতে পারচি না। তোর কি মত?"

সত্যেন্দ্র বইগুলি আলমারিতে সাজাইতে সাজাইতে বলিল "এ বেশ থাকা গেছে মা, আর বে-টে করে কাজ নাই। হয়ত সে আবার আর এক রকমের হ'য়ে বসবে, তোমার সঙ্গে বনিবনা হবে না। কেবল অশান্তি বেড়ে উঠবে বইত নয়।"

উমাশশীর একটু রাগ ও অভিমান হইল। মনে মনে বলিলেন "বনা-বনি হবে না। কেন? আমি কি সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াচ্ছি। প্রকাশ্যে কোনও উত্তর দিলেন না। বিবাহের জন্য উমাশশীর ব্যস্ত হইবার অনেকগুলি কারণ দেখা দিয়াছিল।

বি, এ, ফেল হইয়া সত্যেন্দ্র প্রথমে চাকরীর জন্য উমেদারী করে। কিন্তু তাহাতে যখন মনোমত কর্ম্ম জুটিল না, তখন স্বাধীনতার দোহাই দিয়া বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত সত্যেন্দ্র মাতার নিকট হইতে দশহাজার টাকা লইয়া ইংরাজপল্লিতে একটি ব্যবসা খুলিল।

সকালে দুইটি অন্ন মুখে দিয়া সাহেব সাজিয়া কর্ম্মস্থলে রওনা হয়, আর রাত্রি একটার কম কোনও দিন গৃহে ফিরিতে পারে না। উমাশশী প্রায়ই খাবার ঢাকা দিয়া পুত্রের জন্য বসিয়া থাকেন। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকেন, কখন পুত্র আসিবে, হত সাড়া পাইবে না ; দাস দাসীরা সন্ধ্যা না হইতে হইতে শুইয়া পড়ে। হাজার ডাকে সাড়া পাওয়া দায়। এমনও হইয়াছে, দুই একদিন সকাল হইয়া গিয়াছে ; সত্যেন্দ্র বাড়ী আসে নাই। যেমন খাবার তেমন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। উমাশশী হয়ত সেখানেই ঘরের মেঝের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। জাগিয়া দেখেন পূর্ব্বাকাশ রক্তিম বরণ হইয়াছে। ফুটপাথের উপর লোকজন আনাগোনা করিতেছে। পথের ধারে জলের কলের নিকট অনেকগুলি হিন্দুস্থানী ও উৎকলবাসী জড় হইয়া বকাবকী করিতেছে, কেহ ফুটপাথের উপর লোটা মাজিতেছে, কেহ একহাত প্রমাণ নিমডাল লইয়া দাঁতন করিতেছে, কেহ বা তাহাকে কোম্পানির গাছ ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া শাঁসাইতেছে। একটা উড়ীয়া ভারির সহিত একজন মুসলমান ভিস্তির কলের নিকট কলহ বাধিয়া গেল। ভিস্তি তাহাকে ধাক্কা দেওয়ায় একটা কলসী কলের গাত্রে লাগিয়া একবারে দুইখানা। সে দিন উমাশশীর নিকট এসব ঘটনা যেন কেমন নূতন ঠেকিল। যাহার কলসী ভাঙ্গিল, তাহার জন্য উমাশশীর দুঃখ হইল। তিনি ভিস্তির উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। পীড়নকারীর উপর রাগ ও পীড়িতের উপর সহানুভূতির ভাবটি সে দিন উমাশশীর অন্তরে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। বধূমাতার প্রতি তাহার আচরণটা সত্যসত্যই অত্যাচার বলিয়া মনে হওয়ায় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বৌমা শ্বাশুড়ীর প্রাপ্য কর্ত্তৃত্ব ও সম্মানকে, বিনয় ও মিনতির দ্বারা বড় করে নাই, ইহাই তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমানকে তখনও মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। তারপর ঢাকা দেওয়া খাবারগুলি তিনি খাটের নীচে সরাইয়া রাখিলেন ও

একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনুর মা, সতু এসে ফিরে যায়নি ত? কাল আমার একাদশী গিয়েছিল কি না, বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।"

"না দাদাবাবু ত আসেন নি। তা হ'লে শুনতে পেতুম।"

"তোরা সন্ধ্যা না হতেই ঘুমিয়ে পড়িস। বাবা! এত ঘুম কোত্থেকে আসে? ধন্নি তোদের ঘুম!"

ঝি বুঝিল, মা-ঠাকরুণের রাগটা আজ তাদেরই স্কন্ধে পড়বার সুযোগ অনুসন্ধান কর্‌চে, সুতরাং বেশী কথা কওয়া হবে না। সে, ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা মা, দাদাবাবুর কি সারারাত্রি কাজ? এমন ধারা কাজত কারো কখন শুনিনি। অত খাটলে, দুদিনে যে শরীর মাটি হয়ে যাবে। আমরা ত গতর খাটিয়ে খাই—আমরাই পারি না। নটা হো'ক দশটা হোক, এ যে সারারাত্রি কেটে যায়, তবু কিনা দাদাবাবুর কাজ আর শেষ হয় না।" তারপর সুর ফিরাইয়া বলিল, "তুমি মা নেয়ে নিয়ে একটু জলটল মুখে দাও, তুমিও দেখচি দিন দিন দাদাবাবুর জন্য ভেবে ভেবে, না খেয়ে কেমন হয়ে যাচ্ছ।" উমাশশীর বুকের ভিতর যে কি জ্বালা, তাহা তিনি মুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। কোন উত্তর না দিয়া মুখ বুঁজিয়া আস্তে আস্তে স্নান করিয়া তিনি উপরে গেলেন। ঝি বুঝিল, আজ গতিক বড় সুবিধা নয়। অধিক রাত্রি জাগরণ, অনাহার ও নানারূপ দুশ্চিন্তায় উমাশশী মাথা ঘুরিতেছিল। এই সকল কারণের মূলে, তিনি নিজের অন্যায় অধিক করিয়া দেখিতে পাইলেন। প্রতিকারের সূচনা করিতেই পুত্রবধূর উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। কেন সে নিজে আসিল না, কেন আসিবার জন্য বিনয় করিয়া তাঁহাকে পত্র দিল না; তাহা হইলে কি আমি তাহাকে এতদিন না আনিয়া পারিতাম। সে অভিমান করিয়া বাপের বাড়ী বসিয়া রহিল, ইহা কি তাহার গুরুতর দোষ নয়? সে আসিলে কি তাড়াইয়া দিতাম,

না, সতু এমন করিয়া শেষরাত্রে বাড়ী আসিতে সাহস করিত। মনে করিলেন, একবার ঝিকে না হয় পাঠাই, পরক্ষণেই আশঙ্কা হইল আজ সাত বৎসর তাহার কোন সংবাদ লই নাই, কতবার তাহার পিতাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি; আজ কি বলিয়া ঝি গিয়া সেখানে দাঁড়াইবে? কেন, বৌমা নিজের ঘরে নিজে আসিবে, তাহাতে তা'র মান অপমান কি? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, আমি যে তাকে একদিনের জন্য নিজের ঘর বুঝিবার অবসর দিই নাই—কতরকম চিন্তাই উমাশশীর মনে আসিতে লাগিল। ঝি পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে আসিয়া দেখিল, উমাশশী ভিজা মাথায় মেঝের উপর বসিয়া ভাবিতেছেন। চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। দূরে মিছরী ভিজান, ফলমূল যেমন অবস্থায় সে রাখিয়া গিয়াছে, তেমন ভাবেই পড়িয়া আছে। কোনটিও স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার সম্মুখে যাইতে ঝির ভয় হইল; কিন্তু উমাশশীর কষ্ট দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, সে আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। উমাশশীর সংজ্ঞা নাই। তিনি নিস্পন্দ নির্ব্বাক। ঝি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মা-ঠাকরুণ, একটু জল মুখে দাও, বেলা অনেক হলো?"

"হঁ্যা জল, কেন?"

ঝি বলিল, "মা ঠাকরুণ কাল থেকে একাদশী করে আছ, বেলা অনেক হ'য়েছে, দিদিমণিকে কি আজ একবার নিয়ে আসব?" ঘরের কার্ণিশের উপর একটা টিকটিকি শীকার অন্বেষণে নিস্তব্ধ হইয়াছিল, সহসা সে টিক্-টিক্ করিয়া উঠিল। উমাশশী একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "একবার না হয় নিয়ে আয়।" বাগবাজারের নিকটেই সত্যেন্দ্রের ছোট ভগিনী রঙ্গিণীর শ্বশুরবাড়ী। খুব কমই সে বাপের বাড়ী আসে। যখন আসে, সকালে আসিয়া বৈকালে চলিয়া যায়।

রঙ্গিণী যখন আসিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পথে গাড়ী ঘোড়া ও ট্রামের অত্যন্ত ভীড়। কুঠিওয়ালারা আপিস চলিয়াছে, ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা, মাষ্টার প্রোফেসারের সমালোচনা করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ নূতন কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিতেছে মাত্র, সে বন্ধুকে গ্যাসপোষ্টের নিকট দাঁড় করাইয়া কবিতা শুনাইতেছে, মাঝে মাঝে বন্ধুর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কেমন লাগ্‌ল?"

(৪)

রঙ্গিণী আসিয়া উমাশশীর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, অত্যন্ত জ্বর, গা আগুনের মত গরম। নয়নে অশ্রু গড়াইতেছে। সে ধীরে ধীরে ডাকিল, "মা আমি এসেছি।" উমাশশী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যেন কতকটা শান্তি পাইলেন, বলিলেন, "ভাল খাছিস্? শ্বশুরবাড়ীর সবাই ভাল? বড় জ্বর হয়েছে, বস মা বস।"

রঙ্গিণী মাতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাল একাদশী গিয়েছে, ঝিয়ের মুখে শুনলুম, এখনও তুমি মুখে একটু জলপর্য্যন্ত দাও নি, এমন করে কদিন বাঁচ্‌বে মা?" উমাশশীর জ্বরক্লান্ত বিশীর্ণ অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "এখনও বাঁচ্‌তে হবে? আর যে সহ্য হয় না মা। সতুর ব্যাপার দেখে, আর আমার বাঁচ্‌তে সাধ নেই। গেলেই এখন বাঁচি।"

রঙ্গিণী, মাতার ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল কেশগুলি ধীরে ধীরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে; বলিল, "মা একটু জল খাও, নইলে, তোমার জ্বর কম্‌বে না। উমাশশী কন্যার স্নেহানুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। জল খাইয়া উঠিয়া বসিলেন। এমন সময় সত্যেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত

হইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কেশ উচ্ছৃঙ্খল, চক্ষু লাল, দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে, যেন সারারাত্রি মোটেই নিদ্রা যায় নাই। রঙ্গিণীকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলিল, "তুই কখন এলি ? এমন সময় তুই ত আসিস না।"

"দাদা, তোমার জন্য ভেবে ভেবে মা আর বাঁচ্‌বে না। তুমি কাল বাড়ী এস নাই, মা একাদশী করেছিলেন, সারারাত্রি খাবার কোলে করে বসে-বসে সকালে খুব জ্বর। অভিমান করে জলপর্য্যন্ত মুখে দেন নাই।"

সত্যেন্দ্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিল, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল; বলিল, "ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছিস্ ?"

"না। আমি ত এই ঘণ্টাখানেক এসিচি।"

সে তখন চেয়ারখানি টেবিলের নিকট টানিয়া একখানি চিঠি লিখিল, ঝিকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "তুই এখনই হরকালী ডাক্তারের বাড়ী যা—তাঁকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়। আমার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে, বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে পারব না।"

"সে কি দাদা! আবার কি এখনি বেরুতে হবে ?"

"হ্যাঁ। বিলাত থেকে একজন বড়দরের সাহেব ব্যবসাদার এসেছেন, তাঁকে নিয়ে কাল সারারাত্রি ঘুরেছি; আবার বারটার সময় দেখা করবার কথা আছে। যেতেই হবে। আমি যে একজন বড়দরের বিচক্ষণ ব্যবসাদার, তা সে আমার কথাবার্ত্তা শুনে বুঝে নিয়েচে।"

রঙ্গিণী নির্ব্বাক হইয়া ভ্রাতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুখে কথা সরিল না। উমাশশী এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাল থেকে কিছু খাস্‌নি, নেয়ে তাড়াতাড়ি যা হয় দুটো খেয়ে যা।" রঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা

মা রঙ্গিণী তুই নিজে গিয়ে একটু যোগাড় করে নিয়ে সতুকে দুটো ভাত খাইয়ে দে।" মায়ের কথায় আপত্তি করিয়া সত্যেন্দ্র উত্তর করিল, "এখন খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করতে গেলে ঢের দেরী হয়ে যাবে মা। তা'হ'লে সাহেবের সঙ্গে কথার ঠিক থাকবে না।" এ কথায় মা কোন উত্তর দিলেন না, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "না হয় একটু জল খেয়ে যা।" সত্যেন্দ্র জল খাইয়া বলিল, "মা পাঁচশো টাকার বিশেষ দরকার, একটা জিনিস আনবার জন্য আজ বিলাতী মেলে আগাম টাকা পাঠাতে হবে, নইলে সে জিনিসটা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছবে না।" উমাশশী দ্বিরুক্তি করিলেন না, বিছানার নীচে হইতে লোহার সিন্দুকের চাবিটী বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "দুটি খেয়ে গেলে হ'তো না।" সত্যেন্দ্র সিন্দুক খুলিয়া পাঁচশোর জায়গায় বোধ হয় আটশো টাকা লইল; পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি হিসাব করিল, পরে বলিল, "এখনও ডাক্তার এলো না—বালিগঞ্জ পৌঁছতে প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগবে। এখন সাড়ে দশটা, আর দেরী কর্‌তে পারি না।"

রঙ্গিণী বলিল, "ডাক্তার কি বলেন, শুনে যাও না দাদা?"

"না আর অপেক্ষা কর্‌লে সব পণ্ড হয়ে যাবে" বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। জননীর নয়নপ্রান্তে কয়েক বিন্দু অশ্রু জমিয়াছে দেখিয়া রঙ্গিণী অঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল। ভ্রাতার আচরণে মা যে মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছেন, তাহা রঙ্গিণীর বুঝিতে বাকি রহিল না। তারপর দুইদিন সত্যেন্দ্র বাড়ী ফিরিল না, একখানি পত্রে লিখিয়া জানাইল, "সাহেবের সঙ্গে হাজারীবাগ চলিলাম, বিশেষ প্রয়োজন।"

উমাশশীর জ্বর ত্যাগ হইল না, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জ্বরের প্রবলতার মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে, এক একবার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন "সতু এলি?—না বলে কয়ে কি বিদেশ যায় বাছা—অমন করে আর

ব্যবসা করতে হবে না—রঙ্গিণী তুই যা নিজে গিয়ে সতুকে খাওয়াগে” বলিয়া কন্যার সেবাপরায়ণ হাতখানি নিজের অঙ্ক হইতে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দেন। রঙ্গিণী পুনরায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, “মা, দাদা ত আসেন নাই—তুমি ও সব কি বলচ ?” উমাশশী আর কোন উত্তর দেন না, নির্ব্বাক হইয়া নিরুপায় ভাবে কন্যার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন—অন্তরের সমস্ত বেদনা যেন সে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া আসে, তখন কন্যার হাতখানি টানিয়া ব্যাকুল ভাবে বক্ষের উপর পুনরায় চাপিয়া ধরেন এবং নিমীলিত নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে। জননীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া রঙ্গিণী বড়ই চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়িল। ডাক্তার তিন দিনের দিন বলিয়া গেলেন,“জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী ; মাথারও গোলমাল রহিয়াছে, খুব সাবধানে রাখিবেন। সত্যেন্দ্রবাবু কবে আসিবেন ?” রঙ্গিণীর স্বামী রাধাবিনোদবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন, “কিছু সংবাদ পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন।”

পাঁচ দিন পরে সত্যেন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিল,মায়ের অবস্থা খুব খারাপ—জ্বর বিকারে দাঁড়াইয়াছে এবং বিকারের মধ্যে যে সমস্ত প্রলাপ বকিতেছেন, সবই তাহার ও রাধারাণীর কথা। মায়ের অসুখ হওয়াটা যেন অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া সত্যেন্দ্রের মনে হইল। সত্যেন্দ্র আসিবার পর হইতে ক্রমে জ্বরের প্রকোপও হ্রাস পাইতে লাগিল—কিছুদিন পরে ডাক্তার বলিলেন, “রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হ’য়ে পড়েছেন—জ্বর যদিও নাই, তবে বায়ুপরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজন।” পথ্য করিবার দিনকয়েক পরে অনন্যোপায় হইয়া সত্যেন্দ্র, মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ গমন করিল। উমাশশী ইহাতে যেন অনেকটা শান্তি পাইলেন।

(৫)

বৈদ্যনাথ জংসনের নিকটেই সত্যেন্দ্র একখানি বাড়ী ভাড়া লইল।

যে বাড়ীখানি লইল, তাহার পার্শ্বের বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অল্প দিনেই ইঁহাদের খুব আত্মীয়তা হইয়া গেল। বাড়ীর নিকট দিয়া দেওঘর লাইন গিয়াছে। অল্পদূরেই বড় লাইন। সম্মুখে দিগোড়িয়া পাহাড়; অদূরে ময়ূর-কণ্ঠ ত্রিকুট মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এখানে আসিয়া উমাশশী যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মনে মনে নিজের পীড়িত-অবস্থাটাকে যেন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা অনুমান করিলেন। অনেক দিন সত্যেন্দ্র এমন করিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলে নাই—অনেক দিন সে এমন করিয়া সংসারের প্রতি ফিরিয়া দেখে নাই, পলাতক পাখী আজ যেন বহু আয়াসে পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, প্রকৃতির অপরূপ শোভা-সম্পদ, জননী-ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ মমতা কিছুতেই সত্যেন্দ্র যেন নিজের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু একটা মধুর আকর্ষণ সম্প্রতি তাহার মন অপহরণ করিয়াছিল, তাহা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না।

উমাশশী বলিলেন—"সতু বেশ জায়গা, এ দেশ ত্যাগ করে আমার আর কোথাও যেতে মন সরে না। মাঝে মাঝে বাবা বৈদ্যনাথকে দেখে আস্‌চি, আর আনন্দে হৃদয় ভরে যাচ্চে।"

রঙ্গিণী বলিল, "এই সব দেশে বাস কর! দুধ যেমন সস্তা, জল হাওয়া তেমন স্বাস্থ্যকর!"

পাশের বাড়ীর মেয়েটী বেড়াইতে আসিয়া উমাশশী ও রঙ্গিণীর পশ্চাতে অল্প ঘোমটা দিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমরা আজ তিনমাস এসেচি, কোন অসুখ-বিসুক নেই, তবু তখন ভাল জল-হাওয়া পড়ে নি। বাবা বলেন, কাছাকাছির ভিতর এমন জায়গা বড় বেশী নেই।"

সত্যেন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি

চাহিয়া উত্তর করিল, "মধুপুরও খুব ভাল—ওখানে থাওয়া-দাওয়া সব রকম মেলে, সকল গাড়ীও দাঁড়ায়।"

সত্যেন্দ্র খুব আশা করিয়াছিল, যে তা'র উত্তরের বিরুদ্ধে কিশোরী নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিবে। তাহার সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত সত্যেন্দ্র অনেকদিন এরূপ অযাচিতভাবে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা সরম মনে করে নাই। সুন্দরী তাহার দিকে না চাহিয়া রঙ্গিণীর পিঠে হাত দিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "হতে পারে, মধুপুর ভাল; কিন্তু সকলের সঙ্গে ত আর সকলের মতের সব সময় মিল হয় না।"

এত সংক্ষেপেই সে যে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে, সত্যেন্দ্র তাহা আশা করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, আজিকার এই কথার প্রত্যুত্তরে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিবে। কিশোরীও তাহার পিতার মতের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তীব্র প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়া সত্যেন্দ্রের সহিত একটা তর্কের মধ্যে পড়িয়া যাইলে তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে; কিন্তু যখন তাহা হইল না, তখন সে আবার আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন ঘটনা ইতিমধ্যে অনেকবার হইয়া গিয়াছে—এ সব তুচ্ছ ব্যাপার উমাশশীর মনোযোগ বড় একটা আকর্ষণ করিত না। পুত্রের এই 'মেলামেশা' ভাবটি উমাশশীর বড় মধুর লাগিত। পুত্র তাঁহার নিকট বসিয়া কথোপকথন করিলে, যেন তাঁহার সকল অভাব, সকল দুঃখ দূর হইত। একটা প্রকাণ্ড অভাব, যে তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা উমাশশী বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। নিজে যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত; কিন্তু নিজের অন্যায় হাজার বুঝিলেও কোনদিন সহানুভূতি প্রকাশ করা, তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সে জন্য তাঁহার মনের ভিতর কষ্ট হইলেও,

আজকাল পুত্রের সদাসর্ব্বদা উপস্থিতি তাহা অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু সত্যেন্দ্র যে খুব সুখে ছিল, তাহা বোধ হইত না। মা ও মেয়ের মধ্যে সকল সময় গল্পগুজব চলিত। সত্যেন্দ্র বড় একটা তাহাদের সহিত যোগ দিত না। যখন পাশের বাড়ীর মেয়েটি বেড়াইতে আসিত, তখন সত্যেন্দ্র প্রায় তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসিত। মুখের উপর বেশ একটি প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিত। উমাশশীর নিকট পুত্রের এই সরল আচরণটি বড়ই মধুর ও স্বাভাবিক মনে হই‌ত।

সেদিন উমাশশী মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অমলা, কই তোমার বাবা এলেন না? কাল না তাঁর আসবার কথা ছিল? কিশোরীর নাম অমলা, বড় শান্ত ও ধীর, বয়স উনিশ কুড়ি হইবে—দেখিতে খুব সুন্দর। অমলার মধ্যে বেশ একটা সরম ও সংযমের ভাব সদাসর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। অমলা আস্তে আস্তে বলিল, "বাবা চিঠি দিয়েছেন, তাঁহার হাতে একটা বড় মকর্দ্দমা আছে, সে জন্য এখন আস্‌তে পেলেন না।"

(৬)

উমাশশী যে দিন বৈদ্যনাথে আসেন, তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্বেই অমলার পিতা চলিয়া গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল আর আসিতে পারেন নাই। নিকটেই অমলাদের একঘর আত্মীয় বাসা লইয়া আছেন, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তিনি এঁদের রাখিয়া গিয়াছেন। অমলার মাতা খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। অমলার দুই বৎসের একটী ভাই, একজন ঝি, বাড়ীর একজন পুরাতন সরকার ও স্থানীয় বামুন, চাকর লইয়া তাহাদের বৈদ্যনাথের ক্ষুদ্র সংসার।

সেদিন, অমলার মা উমাশশীদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অমলার উপর রান্নার ভার পড়িয়াছিল। সুতরাং পরিবেশনের সময় সে জড়সড়

হইয়া একধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জননী অনেকবার তাহাকে পরিবেশন করিতে বলিলেন ; কিন্তু সে কোনও মতেই রাজি হইল না ; বরং মায়ের কাণে কাণে বলিয়া দিল "সে যে রাঁধিয়াছে, এ কথা প্রকাশ হইলে, সে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে। রঙ্গিণী মধ্যে কি করিতে আসিয়া একবার দেখিয়া গিয়াছিল, যে অমলা স্নান করিয়া সমস্ত কেশগুলি মস্তকের সম্মুখভাগে আনিয়া গুচ্ছাকারে বাঁধিয়া কটিদেশে কাপড় জড়াইয়া রন্ধনকার্য্যে খুব মনোসংযোগ করিয়াছে।

উমাশশী অমলার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন এসেছেন, কই একদিনও জামাই এলো না? অমলা মেয়েটি বড় ভাল—ও দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী গিয়া গল্পগাছা করে, আমার বড় ভাল লাগে।"

অমলার মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী বলিল, "অমলা যখন মহাভারত পড়ে এত মিষ্টি লাগে যে, কি বলবো—ওর বড় ভাব আসে—কোন্‌খানটা জান মা, মনে পড়চে না? অমলা যে প্রায় সেইখানটাই পড়ে।" অমলা ধীরে ধীরে বলিল, "কেন, রঙ্গিণী দিদির কি সেখানটা পড়ে দুঃখ হয় না?" সুতরাং উমাশশীর প্রশ্ন এখানেও চাপা পড়িয়া গেল।

সত্যেন্দ্র অমলাকে সমর্থন করিবার এমন সুযোগটি ত্যাগ করিতে পারিল না। সে তখন আহারে বসিয়াছে, মুহূর্ত্তের ভিতর সহানুভূতি-সূচকস্বরে বলিল, "এমন কোন লোক নাই, যে একজন সতী নারীর সভা-স্থলে নির্যাতন নীরবে সহ্য করতে পারে. শুধু তাই নয়, সেখানে আবার তাঁর স্বামীরা বর্ত্তমান! দুঃখের সঙ্গে রাগও হয়।"

অমলা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বরং অল্প উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া উমাশশীর প্রতি বেদনা-করুণ দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল, "ওখানে দ্রৌপদীর অসাধারণ স্বামীভক্তিই প্রকাশ পে'য়েছে। স্বামীর উপর

অভিমান না ক'রে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতাই দেখিয়েছে, কি বল মা ?" এ কয় দিনে অমলা উমাশশীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং উমাশশীর সহিত এতটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন না করিলে উমাশশীর স্নেহকে যেন খাট করা হইত।

অমলার মাতা সত্যেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছিলেন। তিনি চকিতে একবার অমলার মুখের প্রতি তাকাইয়া পরক্ষণেই সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। সত্যেন্দ্র তখন অমলার কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল। নিজের জীবনের অভ্যন্তরে, যে এমন একটী অন্যায় ব্যাপার বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, হঠাৎ আঘাত পাইয়া আজ তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন একরকম হইয়া গেল—তখন তার নিজের কথাকে মোটেই যুক্তি দিয়া দাঁড় করাইবার সামর্থ্য রহিল না—নির্ব্বোধের মত উত্তর করিল, তাঁরা বড় একটা স্ত্রীর সম্মান বা মর্য্যাদা বুঝিতেন না; ধর্ম্ম এবং যুদ্ধই তাঁদের তখনকার দিনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন সবল প্রতিপক্ষকে আপনার সীমার মধ্যে আহ্বান করিয়া নিজ শক্তি দেখাইবার গর্ব্ব করিয়া থাকে—আজ অমলাও জননীর পাশে থাকিয়া সত্যেন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া তাহার অসামঞ্জস্য উত্তরগুলিকে বারংবার সর্ব্বসমক্ষে মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া দিতে লাগিল।

অমলা মাতার দিকে ফিরিয়া অল্প উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল, "তখনকার লোকেরা বরং স্ত্রীজাতীর মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই যুদ্ধ বিগ্রহ কর্‌তেন। সেটা কি ধর্ম্মের জন্য নয় ? কি বল মা ?"

অমলার মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উমাশশী বলিলেন, "তাইত সীতার

জন্যই রামায়ণ, আর দ্রৌপদীর জন্যই অতবড় মহাভারত, একথা কে না জানে ?”

সত্যেন্দ্র যদিও হারিয়া গেল, তথাপি যাহার নিকট হারিল, সর্ব্বান্তঃ-করণে পরাজয় যেন তাহার নিকট বাঞ্ছনীয়। ভাবিল, এমন করিয়া যদি কিশোরীর সহিত তাহার বেশ একটু আলাপ হয়, তবে সত্যেন্দ্র যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পায়। উপেক্ষার ভিতর দিয়া যদি অনুগ্রহলাভ হয়,—তবে তাহাতেও সত্যেন্দ্রের যেন কোনও লজ্জা অপমান ছিল না।

উমাশশী আহারে বসিয়া আপনার বধূমাতার ও তাহার পিতার অযথা অনেক নিন্দা করিলেন। বৌয়ের মা'টিও যে ভাল লোক নন, তাহাও যে না বলিলেন, তাহাও নয়। মাঝে মাঝে বলিলেন, “অমলা যেমন চমৎকার মেয়ে—তাহার বৌটি যদি তেমন হইত,” অল্প সুর মিহি করিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে কহিলেন, “তাহা হইলে কি আজ তাঁর ঘর—এমন শূন্য হ'য়ে থাক্‌ত।”

ইহার কিছুদিন পরেই রঙ্গিণী, শাশুড়ীর হঠাৎ অত্যন্ত অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিল। তখন অমলা না হইলে, উমাশশীর এক দণ্ড চলে না। অমলাও উমাশশীর যথেষ্ট সেবা করে। মধ্যে এক-দিন উমাশশীর অসুখ হয়, অমলা সারারাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করে। উমাশশী বলিলেন, “অম” তিনি আদর করিয়া তাহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন, “আমরা যখন এখান থেকে চলে যাব, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে, সেখান থেকে তোমার ‘পাতান’ মাকে পত্র দিবে ত ?” অমলা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, “দিব।”

অমলা একদিন বলিল, “মা তোমার বৌকে কিন্তু এখন নিয়ে আসা উচিত। এমন করে আর ফেলে রাখা ভাল দেখায় না।”

উমাশশী বলিলেন—“তোমার মত এমন সোণার বৌ কি সে মা, যে,

শাশুড়ী না হয় রাগ করেচে, আমি কেন যাই না—তা হবে না, তাহলে যে তার মানের হানি হবে মা।” একথায় অমলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার বুকের ভিতর তুমুল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। একবার মনে হইল, উমাশশীর পাদুটি জড়াইয়া বলে, সে আসিতে চাহিলে তুমি যে, মা তাহাকে আসিতে দাও না।

রঙ্গিণীর শাশুড়ী সারিয়াছেন। আসিয়া অবধি রঙ্গিণী মাকে একখানিও পত্র লিখিতে সময় পায় নাই। আজ মধ্যাহ্নে সকল কাজ ত্যাগ করিয়া পত্র লিখিবে স্থির করিল। বাক্স খুলিয়া চিঠির কাগজ বাহির করিতে গিয়া দেখিল, অমলার একখানি বহি তাহার নিকট রহিয়াছে। বৈদ্যনাথ হইতে আসিবার পূর্ব্বদিন, সেখানি সে অমলার নিকট হইতে পড়িতে লইয়াছিল, কিন্তু, সহসা তাড়াতাড়ি চলিয়া আসায় সেখানি ফেরৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। বহিখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতেই, তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র মেঝের উপর পড়িয়া গেল। রঙ্গিণী মনে করিল, অমলা বোধ হয় ভুলিয়া স্বামীর পত্রখানি পুস্তকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; দিবার সময়, সেকথা আর মনে ছিল না। অমলা বড় চাপা মেয়ে, কিছুতেই সে তার স্বামীর কথা বল্‌ত না—রঙ্গিণীর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, ভাবিল যাহা মানুষ গোপন ক’রে রাখ্‌তে চায়, কি আশ্চর্য্য! কত অসাবধানেই তাহা ধরা পড়ে যায়। পত্রখানির খামের উপর ইংরাজিতে শিরোনামা লেখা ছিল, সুতরাং রঙ্গিণী খামের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্ব্বে একবার তার মনে হইয়াছিল, পরের পত্র পড়িব কি না? কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিতে পারে নাই।

সে আগ্রহে পত্রখানি পড়িল ঃ—“বোধ হয় এতদিনে তাঁহারা আসিয়াছেন। আমার মাথার দিব্য, তুমি কোন রকমে তাঁহাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ কর্‌বে না। রাধারাণীকে এই অজ্ঞাতবাস কর্‌তেই হবে। এতটা লুকোচুরি করবার মোটেই প্রায়োজন ছিল না; যদি তোমরা আমার সঙ্গে চলে আসতে সম্মত হতে। তুমি কিন্তু, জামাই দেখবার এবং বেয়ানের অভিমতটা বুঝবে বলে রয়ে গেলে—বোধ হয় তাঁহাদের সঙ্গে এতদিনে বেশ আলাপ পরিচয় হয়েচে। একটা কথা স্মরণে রেখ যে, রাধারাণীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। অদৃষ্টের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। তাঁহাদিগকে যতদূর তোষামোদ করবার করিয়া অবমানিত হয়েছি, তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। সে সব কথা সদাসর্ব্বদা স্মরণ করিও—কোন মতে যেন রাগারাগির কথা মুখ হ'তে বাহির না হয়। মেয়ের কষ্টের জন্য, কে এমন বাপ মা আছে, যে হৃদয়ে ব্যথা পায় না। তা বলে যে, সকল অপমান ও অবজ্ঞা চিরদিন মাথা পেতে নিতে হবে, এমন কথা কেউ স্বীকার করে না। সত্যেন্দ্র ছেলেটি বেশ দেখেই মেয়ে দিয়াছিলাম; কিন্তু এমন হ'বে কে জানিত? মেয়ে যখন গর্ভে ধারণ করেছ, তখন লাঞ্ছনা, অপমান পদে পদে সহ্য করেতেই হবে জানা উচিত। সত্য বটে, সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমার বাহিরে গেলে, মানুষ অনেক সময় নিরাশায় আর ধৈর্য্যকে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না জানি, তথাপি আমার মাথার দিব্য, কিছুতেই তাঁহাদের নিকট পরিচয় দিয়ে, অপমানের বোঝা ভারি করিও না। আশা করি খোকা, রাধারাণী, সরকার মহাশয় আর আর সকলে ভাল আছেন। তুমি বোধ হয়, জামাই ও মেয়ে এত কাছাকাছি পর-পর হয়ে রয়েছে ভেবে, বৈদ্যনাথের জল-খাওয়ার অপযশ ঘোষণা করবার আয়োজন করছ; কিন্তু, আমার মনে হয়, বাবা

বৈদ্যনাথ কখনই অতটা অপযশ আপনার কাঁধে বইতে রাজি হবেন না। আমি ভাল আছি। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ সকলকে জানাইবে। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু।

পত্র পড়িয়া রঙ্গিণী নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ের ভিতর হর্ষ ও বিষাদ একসঙ্গে একটা মহাবিপ্লব বাধাইয়া দিল। আর পত্র লেখা হইল না। সে তখনই স্বামীকে সকল কথা বলিয়া মাকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। সেই রাত্রের প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে রাধাবিনোদ বাবু ও রঙ্গিণী একরাশ ফুল লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিল।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।